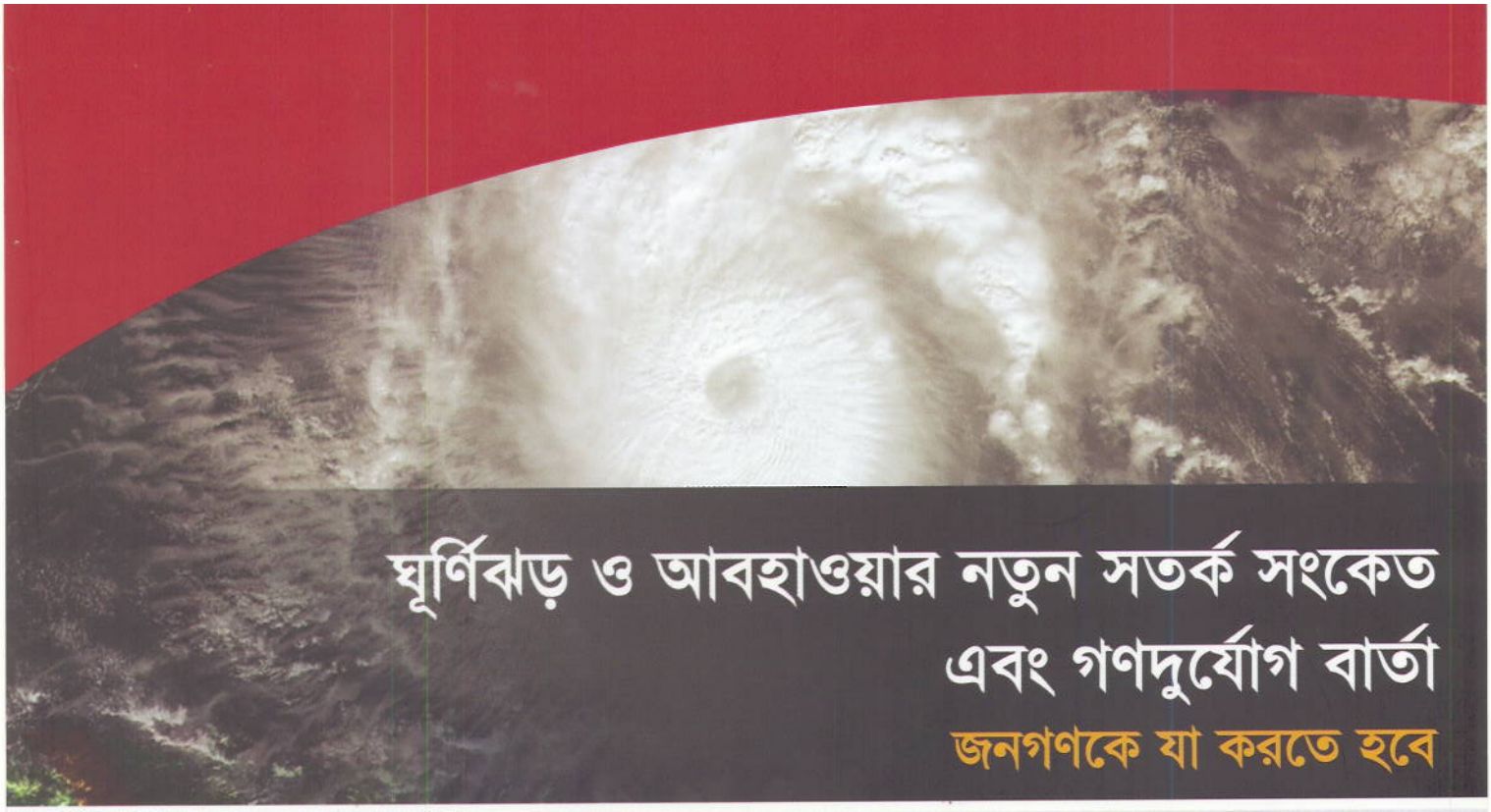

ঘূর্ণিঝড় ও আবহাওয়ার নতুন সতর্ক সংকেত এবং গণদুর্যোগ বার্তা

জনগণকে যা করতে হবে

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

ঘূর্ণিঝড় ও আবহাওয়ার নতুন সতর্ক সংকেত
এবং
গণদুর্যোগ বার্তা

বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা ও সভাপতি, চূড়ান্তকরণ কমিটি ঃ প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী

আবহাওয়ার বিশেষ বুলেটিন দ্রুত প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি

মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	আহবায়ক
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার	সদস্য
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন	সদস্য
মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর	সদস্য
মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	সদস্য
চেয়ারম্যান, ওয়ারপো/ পরিচালক ফ্যাপ-১০	সদস্য
চেয়ারম্যান, স্পারসো	সদস্য
চেয়ারম্যান, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
পরিচালক, সিপিপি	সদস্য
পরিচালক (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	সদস্য-সচিব

বিশেষ কারিগরী সহযোগিতায় ঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

গণদুর্যোগ বার্তা পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও সম্পাদনা ঃ **এ. এইচ. এম আবদুল্লাহ্**
পরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ)

সহযোগিতায় ঃ **শাহ্নাজ রব**
উপ-পরিচালক
প্রবীর কুমার দাস
প্রোগ্রামার
সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
কমিউনিকেশন মিডিয়া স্পেশালিস্ট এবং
এইচ. এম. কবির হোসেন
গবেষণা কর্মকর্তা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

প্রকাশনা ও প্রচারে ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
আর্থিক সহযোগিতায় ঃ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)

UNDP Bangladesh

সূচিপত্র

ঘূর্ণিঝড় ও আবহাওয়ার নতুন সতর্ক সংকেত এবং গণদুর্যোগ বার্তা

শুভেচ্ছা বাণী	৫
মুখবন্ধ	৬
ভূমিকা	৭-৮
ঘূর্ণিঝড় ও আবহাওয়ার পুনর্বিন্যস্ত নতুন সতর্ক সংকেতসমূহের বিবরণ ও ব্যাখ্যা	৯-১০
ঘূর্ণিঝড়ে পতাকা উত্তোলন পদ্ধতি	১০
গণদুর্যোগ বার্তা	১১-১৪
ঘূর্ণিঝড়	১৫-১৭
অন্যান্য আপদ ও দুর্যোগে জনগণের করণীয়	১৮
বন্যা	১৮-২০
ভূমিকম্প	২০-২২
টর্নেডো ও কালবৈশাখী	২২
নদীভাঙন	২৩
সুনামি	২৪-২৫
আর্সেনিক দূষণ	২৫
অগ্নিকাণ্ড	২৬-২৮
সাপে কাটা	২৮
হেপাটাইটিস বা জন্ডিস	২৯
রক্তক্ষরণ	২৯
জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারণা	৩০
খরা	৩১-৩২
বজ্রপাত	৩৩
ভূমিধস	৩৪
আকস্মিক বন্যা/পাহাড়ি ঢল	৩৪-৩৫
জলাবদ্ধতা	৩৫
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের দায়িত্ব	৩৬-৩৭
উপসংহার	৩৮

সূচিপত্র

ঘূর্ণিঝড় ও আবহাওয়ার নতুন সতর্ক সংকেত এবং গণদুর্যোগ বার্তা

শুভেচ্ছা বাণী	৫
মুখবন্ধ	৬
ভূমিকা	৭-৮
ঘূর্ণিঝড় ও আবহাওয়ার পুনর্বিন্যস্ত নতুন সতর্ক সংকেতসমূহের বিবরণ ও ব্যাখ্যা	৯-১০
ঘূর্ণিঝড়ে পতাকা উত্তোলন পদ্ধতি	১০
গণদুর্যোগ বার্তা	১১-১৪
ঘূর্ণিঝড়	১৫-১৭
অন্যান্য আপদ ও দুর্যোগে জনগণের করণীয়	১৮
বন্যা	১৮-২০
ভূমিকম্প	২০-২২
টর্নেডো ও কালবৈশাখী	২২
নদীভাঙন	২৩
সুনামি	২৪-২৫
আর্সেনিক দূষণ	২৫
অগ্নিকাণ্ড	২৬-২৮
সাপে কাটা	২৮
হেপাটাইটিস বা জন্ডিস	২৯
রক্তক্ষরণ	২৯
জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারণা	৩০
খরা	৩১-৩২
বজ্রপাত	৩৩
ভূমিধস	৩৪
আকস্মিক বন্যা/পাহাড়ি ঢল	৩৪-৩৫
জলাবদ্ধতা	৩৫
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের দায়িত্ব	৩৬-৩৭
উপসংহার	৩৮

শুভেচ্ছা বাণী

সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে এনে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে সচল রাখা। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশকে প্রতিবছর কোন না কোন দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। এসব দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, কালবৈশাখী, টর্নেডো, নদী ভাঙন, নদী ভরাট, জলবায়ুর পরিবর্তন, ভূমিকম্প, সুনামি, ভূমিধস, অগ্নিকাণ্ড, নৌ ও সড়ক দুর্ঘটনা, ভবন ধস এবং পরিবেশের জন্য ব্যাপক ক্ষতিকারক বিভিন্ন রোগবালাই ও মহামারী প্রভৃতি। এসব দুর্যোগের ফলে আমাদের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক অগ্রগতি বিভিন্ন সময়ে বাধাগ্রস্ত হয় এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর সূদুরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্য করা গেছে যে, এখন পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং বন্যায় আমাদের দেশে জানমালের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে।

আমরা জানি দুর্যোগ প্রতিহত করা সম্ভব নয়, কিন্তু কার্যকরভাবে মোকাবিলা করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রয়োজন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং জনগণকে দুর্যোগ মোকাবিলায় সজাগ ও দক্ষ করে তোলা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বা দুর্যোগের বার্তা প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে সতর্ক করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যথাসময়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে দুর্যোগ মোকাবিলায় সতর্ক ও সক্ষম করে গড়ে তোলা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে এমন ভাষায় আবহাওয়ার পূর্বাভাস বা দুর্যোগ বার্তা প্রচার প্রচারণা এবং তৃণমূল পর্যায়ে তা পৌঁছে দেয়া। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পূর্বের আবহাওয়া বার্তার পরিমার্জন ও সংশোধনের মাধ্যমে নতুন আবহাওয়া বার্তা সরকার অনুমোদন করেছে যা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেশে কার্যকর করা হবে।

সংশোধিত নতুনরূপের আবহাওয়া বার্তা ও নবপ্রবর্তিত দুর্যোগ বার্তা সম্পর্কে এবং বিভিন্ন দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে জনগণকে সক্ষম করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ লক্ষ্য অর্জনে এ পুস্তিকা ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আশা করি পুস্তিকাটি লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, জাতীয় বিশেষজ্ঞগণ এবং সকল স্টেকহোল্ডারসহ যারা এ পুস্তিকা প্রণয়নে কার্যকর অবদান রেখেছেন তাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি এ পুস্তিকাটি প্রকাশনা ও প্রচারের উদ্দেশ্যের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
মন্ত্রী
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

বিদ্যমান ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত ও আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি বার্তা যুগোপযোগী, বোধগম্য ও কার্যকরী করার জন্য উপদেষ্টা পরিষদ ২রা মার্চ, ২০০৮ তারিখে নতুন ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত ও আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি বার্তা অনুমোদন করেছে। পূর্বে ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত ও আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ক্ষেত্রে সমুদ্র বন্দরের জন্য ১১টি ও অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরের জন্য ৪টি সংকেত প্রচলিত ছিল। সংকেতসমূহ সহজীকরণ, স্পষ্টীকরণ এবং জনগণ যাতে সহজে বুঝতে পারে সে লক্ষ্যে ১৯৯৯ সাল থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সম্প্রতি প্রফেসর ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সভায় পূর্বের ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত ও আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি সংশোধনের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তাব করা হয়। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সাথে পরামর্শক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো প্রস্তাবটি খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত সারসংক্ষেপের আলোকে উপদেষ্টা পরিষদ পূর্বে প্রচলিত সমুদ্র বন্দরের জন্য ১১টি ও নদী বন্দরের জন্য ৪টি সহ মোট ১৫টি সতর্ক সংকেতের স্থলে ৮টি সংকেত নির্ধারণ করে। সমুদ্র বন্দর ও নদী বন্দরের জন্য সংকেত সমূহকে পুনর্বিন্যস্ত করে উভয় ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

সমুদ্র ও নদীতে বিভিন্ন যানে কর্মরত নাবিক ও সারেংগণ, গভীর সমুদ্রে, নদীর মোহনায়, মাছ ধরতে যাওয়া ছোট ছোট নৌযানের জেলে সর্বোপরি মূল ভূ-খন্ডের জনগণ যাতে এ নতুন সতর্ক সংকেত সহজে বুঝতে পারেন এবং এ অনুযায়ী জানমাল রক্ষায় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন সেজন্য এ পুস্তিকা প্রকাশ ও ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বোধগম্য ভাষায় সংকেতসমূহ ও করণীয় সম্পর্কে সহজ বর্ণনা থাকায় জনগণের কাছে এ পুস্তিকা অত্যন্ত সমাদৃত হবে। পুস্তিকার বর্ণনানুযায়ী জনগণ ঘূর্ণিঝড়, টর্ণেডো, কালবৈশাখী ও বন্যাসহ বিভিন্ন দুর্যোগের সময় কার্যকর সাবধানতা অবলম্বন করবেন ও জানমাল রক্ষায় সক্ষম হবেন বলে আশা করছি।

এ ছাড়া এমন কিছু দুর্যোগ যেমন ভূমিকম্প, সুনামি, অগ্নিকাণ্ড, ভবন ধস, ভূমিধসসহ বিভিন্ন আপদ রয়েছে যার পূর্বাভাস করা যায়না। তাই এ বিষয়ে পূর্ব-সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কিছু তথ্য এ পুস্তিকায় সংযোজন করায় জনগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

আমি মনে করি পুস্তিকাটি সকল ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে জনগণকে প্রয়োজনীয় তথ্য যোগাবে। এছাড়া ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে ৪নং হুঁশিয়ারি সংকেত ও গণদুর্যোগ বার্তা প্রচারিত হবার সাথে সাথে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও সাবধানতা অবলম্বনের জন্য জনগণকে আরো দক্ষ ও কৌশলী করে তুলতে অত্যন্ত কার্যকর অবদান রাখবে।

পরিশেষে ঘূর্ণিঝড় ও আবহাওয়ার নতুন সতর্কসংকেত এবং গণদুর্যোগ বার্তা পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রচারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আশা করি দুর্যোগের সময় জনগণের জানমাল রক্ষায় আমাদের সবার এ সম্মিলিত প্রয়াস সফল হবে।

(মোঃ মোখলেছুর রহমান)
সচিব
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।

ভূমিকা

দেশে বিদ্যমান ঘূর্ণিঝড় সতর্কসংকেত ও আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তির বার্তায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই সংকেত ও বার্তাগুলো সাধারণ মানুষের বোধগম্য করা এবং দুর্যোগ কোন পর্যায়ে ও কোন এলাকায় এর কি প্রভাব হতে পারে তা সুস্পষ্ট ভাষায় ও বিস্তারিতভাবে প্রচার করাই এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও আবহাওয়া অধিদপ্তর এজন্য জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একসাথে কাজ করেছে।

নতুন পদ্ধতিতে নৌবন্দরের সতর্কসংকেতে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর সমুদ্র বন্দরকেন্দ্রিক ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত পদ্ধতিতে বাতাসের গতিবেগ অনুযায়ী সংকেত নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের অনুষঙ্গ হিসেবে আসা জলোচ্ছ্বাসে কোন কোন এলাকায় কত উঁচু প্লাবন হতে পারে তাও ঘোষণা করা হবে।

এ ছাড়া সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়জনিত দুর্যোগের সময় বাংলাদেশ আবহাওয়া অফিস থেকে পূর্বাভাস ও ০৪ নং হুঁশিয়ারি সংকেত প্রচারের পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর উদ্যোগে প্রচার করা হবে 'গণদুর্যোগ বার্তা'। এই বার্তায় দুর্যোগ আক্রান্ত কোন এলাকায় কি ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে সে সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দেয়া এবং দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকার জনগণের কোন অবস্থায় কি করণীয় তা প্রচার করাই হবে এর উদ্দেশ্য।

নতুন সতর্ক সংকেত, আবহাওয়া বার্তা ও দুর্যোগ বার্তার বৈশিষ্ট্য ঃ

নদী বন্দরের সংকেত ঃ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় নৌপথে নিরাপদ চলাচল ও জানমাল রক্ষার্থে বিদ্যমান পদ্ধতিতে নদীবন্দরগুলোর জন্য চারটি সতর্ক সংকেত প্রচলিত আছে। এর মধ্যে নৌ সতর্কসংকেত ১ ও নৌ হুঁশিয়ারি সংকেত ২ ব্যবহার করা হয় কালবৈশাখী ও বর্ষাকালীন ঝড়ো হাওয়ার ক্ষেত্রে। আর নৌ বিপদ-সংকেত ৩ ও নৌ মহাবিপদ-সংকেত ৪ ব্যবহার করা হয় সমুদ্রবন্দরকেন্দ্রিক বড় ঝড় কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে। সমুদ্রবন্দরকেন্দ্রিক সতর্ক সংকেত যখন ১০ নম্বর মহাবিপদ-সংকেতে ওঠে তখন নদীবন্দরে থাকে ৪ নম্বর মহাবিপদ সংকেত।

সরকার অনুমোদিত নতুন পদ্ধতিতে নদীবন্দরের জন্য মোট ছয়টি সংকেত চালু থাকবে। তবে তাতে ১ ও ২ নম্বর সংকেত থাকবে না। ছয়টি সংকেতের প্রথমটি হবে স্থানীয় সতর্ক সংকেত ৩। দ্বিতীয়টি হবে স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ৪। এরপর সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে মিল রেখে বিপদ-সংকেত ৬ এবং মহাবিপদ সংকেত ৮, ৯ ও ১০ প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ শুধু নদীবন্দরের জন্য ৩ ও ৪ নম্বর সংকেতই থাকবে, যা কালবৈশাখী ও বর্ষাকালীন ঝড়ো হাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে। বড় ঝড় কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে সমুদ্র বন্দরের মতোই নদী বন্দরেও বিপদ-সংকেত ৬ এবং মহাবিপদ-সংকেত ৮, ৯ ও ১০ ব্যবহার করা হবে। নতুন পদ্ধতিতে ৫ ও ৭ নম্বর সংকেত থাকছে না।

উল্লেখ্য, নতুন পদ্ধতিতে নদীবন্দরের জন্য ১ ও ২ নম্বর সংকেত না থাকলেও শীতকালে কুয়াশা ও বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির জন্য দৃষ্টিগ্রাহ্যতা কমে গেলে নৌ পরিচালনার জন্য এমন সতর্কবার্তা ঘোষণা করা হবে, যাতে সাবধানে চলার নির্দেশ থাকবে।

সমুদ্রের জন্য সংকেত ঃ প্রচলিত পদ্ধতির ১১টির স্থলে নতুন পদ্ধতিতে সমুদ্র ও সমুদ্রবন্দরের জন্য মোট আটটি সংকেত প্রবর্তন করা হচ্ছে। এর মধ্যে দূরবর্তী সতর্কসংকেত ১ ও দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত ২ শুধু গভীর সমুদ্র এলাকার জন্য। এর প্রথমটির অর্থ হচ্ছে দূরে, গভীর সমুদ্রে ঘন্টায় ৬১ কিলোমিটার পর্যন্ত বেগের ঝড়ো হাওয়া অঞ্চল রয়েছে। এই ঝড় সামুদ্রিক ঝড়েও পরিণত হতে পারে। বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজ এবং গভীর সমুদ্রে অবস্থানরত নৌযানসমূহ এর সম্মুখীন হতে পারে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। দ্বিতীয়টির অর্থ হচ্ছে- দূরে, গভীর সমুদ্রে ঝড় সৃষ্টি

হয়েছে যেখানে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৬২ থেকে ৮৮ কিলোমিটার পর্যন্ত। বন্দর এখনই এই ঝড়ের কবলে পড়বে না। তবে বন্দর ত্যাগকারী জাহাজ এই ঝড়ের কবলে পড়তে পারে। মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসমূহকেও উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলতে হবে, যাতে স্বল্প সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসতে পারে।

সমুদ্র বন্দরের সংকেত ঃ নদীবন্দরের মতো সমুদ্রবন্দর এবং উপকূলীয় অঞ্চলের জন্যও ঝড়ের সংকেত শুরু হবে স্থানীয় সতর্ক সংকেত ৩ থেকে। এর অর্থ বন্দর ও এর সংলগ্ন এলাকায় একটানা ঘন্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বয়ে যেতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে চলাচলকারী অনুর্ধ্ব ৬৫ ফুট দৈর্ঘ্যের নৌযান, মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে অতি সত্বর নিরাপদ আশ্রয় নিতে হবে।

এর পরেরটি হবে হুঁশিয়ারি সংকেত ৪। এর অর্থ হচ্ছে বন্দর ও সংলগ্ন এলাকা ঘূর্ণিঝড়কবলিত। বাতাসের সম্ভাব্য গতিবেগ ঘন্টায় ৫১-৬১ কিলোমিটার। এ সময় থেকেই ঘূর্ণিঝড়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেয়ার কার্যক্রম শুরু হবে। অনুর্ধ্ব দেড়শ ফুট দৈর্ঘ্যের যেসব নৌযান এই বেগের ঝড়ো হাওয়া প্রতিরোধে সক্ষম নয় সেগুলোকে অনতিবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।

এর পরের সংকেতটি হবে বিপদ-সংকেত ৬। বিপদ-সংকেত ৬ এর অর্থ, মাঝারি তীব্রতাসম্পন্ন সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দর ও সংলগ্ন এলাকায় মাঝারি ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। বাতাসের গতিবেগ হবে ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার। উত্তর বঙ্গোপসাগরের সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

মহাবিপদ-সংকেত ৮-এর অর্থ হচ্ছে প্রচণ্ড তীব্রতাসম্পন্ন সামুদ্রিক ঝড়ের কারণে বন্দরে অতিতীব্র ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। বাতাসের গতিবেগ হবে ঘন্টায় ৮৯ থেকে ১১৭ কিলোমিটার। মহাবিপদ-সংকেত ৯ এর অর্থ অতি প্রচণ্ড তীব্রতাসম্পন্ন একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দর ও সংলগ্ন এলাকায় অতিতীব্র ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। হারিকেনের তীব্রতাসম্পন্ন এ প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের সম্ভাব্য গতিবেগ হবে ঘন্টায় ১১৮ থেকে ১৭০ কিলোমিটার। সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেয়া হবে তখন, যখন সুপার সাইক্লোনের তীব্রতাসম্পন্ন একটি প্রচণ্ডতম সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দর ও সংলগ্ন এলাকায় অতিতীব্র ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। বাতাসের সম্ভাব্য গতিবেগ হবে ঘন্টায় ১৭১ কিলোমিটার এবং তার চেয়েও বেশি। উত্তর বঙ্গোপসাগরের সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

দুর্যোগবার্তাঃ

আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে ৪নং হুঁশিয়ারি সংকেত প্রচারের পর থেকেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে সতর্ক করার জন্য গণদুর্যোগ বার্তা প্রচার করবে। নতুনভাবে সংযোজিত দুর্যোগ বার্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- যে মাত্রার সংকেত প্রচার করা হচ্ছে সেই মাত্রার দুর্যোগে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কোথায় কি পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে সে সম্পর্কে এবং নিরাপদে থাকার জন্য করণীয় সম্পর্কেও জনগণকে যথাযথভাবে অবহিত করা হবে। এছাড়া, যেসব দুর্যোগের পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হয় না সেসব দুর্যোগ সম্পর্কে স্বাভাবিক সময়ে জনগণের করণীয় এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি প্রচার করবে।

মোঃ ফরহাদ উদ্দিন
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

ঘূর্ণিঝড় ও আবহাওয়ার পুনর্বিন্যস্ত নতুন সতর্ক সংকেতসমূহের বিবরণ ও ব্যাখ্যা

দূরবর্তী সতর্ক সংকেত-০১ ঃ এ সময় বাতাসের গতিবেগ হবে ঘন্টায় ৫১-৬১ কিলোমিটার। এটি দূরবর্তী সমুদ্রের জন্য প্রযোজ্য হবে। এটি মূলতঃ দূরে গভীর সাগরে ঝড়ো হাওয়ার যে অঞ্চল রয়েছে, যেখানের বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় সর্বোচ্চ ৬১ কিলোমিটার এবং তা সামূদ্রিক ঝড়ে পরিণত হতে পারে। এর ফলে বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে যাবার পরে জাহাজটি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সম্মুখীন হতে পারে। সংশ্লিষ্টদের সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এ সতর্ক সংকেতটি নদী বন্দরের জন্য প্রযোজ্য নয়।

দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত-০২ ঃ এ সময় বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার। এটি মূলতঃ ০১ নং দূরবর্তী সতর্ক সংকেতের মত দূরবর্তী সমুদ্রের জন্য প্রযোজ্য। দূরে গভীর সাগরে ঝড় সৃষ্টি হয়েছে যেখানের বাতাসের একটানা গতিবেগ ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার। এর ফলে বন্দর এখনই ঝড়ে কবলিত হবে না। তবে বন্দর ত্যাগকারী জাহাজ পথের মাঝে ঝড়ো হাওয়ায় পড়তে পারে। এ সময় মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে হবে যাতে স্বল্প সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারে। এ সতর্ক সংকেতটি নদী বন্দরের জন্য প্রযোজ্য নয়।

স্থানীয় সতর্ক সংকেত-০৩ ঃ এটি সমুদ্র বন্দর উপকূলীয় অঞ্চল ও নদী বন্দরের জন্য প্রযোজ্য হবে। এর ফলে বন্দর ও বন্দরের আশেপাশের এলাকায় ঘন্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগের ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। ঝড়ো হাওয়ার কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগরে এবং নদীতে চলাচলকারী ৬৫ ফুট এবং এর কম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নৌ-যানগুলোকে অতি সত্ত্বর নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।

স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত-০৪ ঃ এটি সমুদ্র বন্দর ও উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য হবে। এর ফলে বন্দর ও আশেপাশের এলাকা ঘূর্ণিঝড় কবলিত। বাতাসের সম্ভাব্য গতিবেগ ঘন্টায় ৫১-৬১ কিলোমিটার । ঘূর্ণিঝড়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেয়ার মতো বিপজ্জনক সময় এখনো আসেনি। ১৫০ ফুট এবং এর কম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট যে সকল নৌ-যান ঘন্টায় ৬১ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত ঝড়ো হাওয়া প্রতিরোধে সক্ষম নয়, সে সকল নৌ-যানকে অনতিবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।

** ০৪ নং স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত দেখানোর পর খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সারাদেশে করণীয় সম্পর্কে এ সভায় দিকনির্দেশনা দেবে। ০৪ নং হুঁশিয়ারি সংকেত দেখানোর পর থেকেই সংশ্লিষ্ট জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ সভায় মিলিত হবে এবং তাদের এলাকার বিষয়ে হুঁশিয়ারি সংকেতে উল্লেখ থাকলে দুর্যোগ মোকাবিলায় সম্ভাব্য সকল প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এসময় থেকে গণদুর্যোগ বার্তা প্রচারেরও ব্যবস্থা নেয়া হবে।

** একটি কথা মনে রাখতে হবে, সমুদ্র বন্দরের জন্য স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ০৪ মানে ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রিক ভয়াবহ ধরনের ঝড়ের পূর্বাভাস যা উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের এক বিশাল অংশে আঘাত করতে পারে।

কিন্তু নদী বন্দরের জন্য স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ০৪ অর্থ মূলতঃ নির্দিষ্ট এলাকায় অস্থায়ী ঝড় ও কালবৈশাখী সংক্রান্ত পূর্বাভাস যা সমুদ্র উপকূল, উপকূলবর্তী এলাকা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরসহ দেশের যে কোন এলাকায় আঘাত হানতে পারে। সুতরাং, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের জন্য প্রযোজ্য স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ০৪ সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থা ও অস্থায়ী ঝড় ও কালবৈশাখীর জন্য প্রযোজ্য স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ০৪ দেখানোর পর গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অস্থায়ী ঝড় ও কালবৈশাখীর জন্য প্রযোজ্য স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ০৪ দেখানো হলে যে সব এলাকার উল্লেখ করা হবে শুধুমাত্র সে সব এলাকায় সতর্কতামূলক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতে বাস্তবায়ন বোর্ডের সভা আহবানের প্রয়োজন হবে না এবং গণদুর্যোগ বার্তা প্রচার করা হবে না।

বিপদ সংকেত-০৬ ঃ এ সময় মাঝারি তীব্রতা সম্পন্ন সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মাঝারি ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। এ সময় ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে এবং নদীতে চলাচলকারী সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

মহাবিপদ সংকেত-০৮ঃ এ সময় প্রচণ্ড তীব্রতা সম্পন্ন সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দরে অতি তীব্র ঝড়ো হাওয়া বিরাজ করবে। প্রচণ্ড এ ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯-১১৭ কিলোমিটার হতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে এবং নদীতে চলাচলকারী সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

মহাবিপদ সংকেত-০৯ঃ এটি প্রচণ্ড তীব্রতা সম্পন্ন একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় যার কারণে বন্দর এলাকা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অতি তীব্র ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। হারিকেনের তীব্রতা সম্পন্ন প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১১৮-১৭০ কিলোমিটার হতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে এবং নদীতে চলাচলকারী সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

মহাবিপদ সংকেত-১০ঃ এ সময় অতি প্রচণ্ড তীব্রতা বিশিষ্ট বা সুপার সাইক্লোনের তীব্রতা বিশিষ্ট প্রচন্ডতম একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দর এলাকায় অতীব তীব্র ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। সর্বোচ্চ তীব্রতা বিশিষ্ট এ ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৭১ কিলোমিটার বা আরো বেশি হতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরের সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

ঘূর্ণিঝড়ে পতাকা উত্তোলন পদ্ধতি

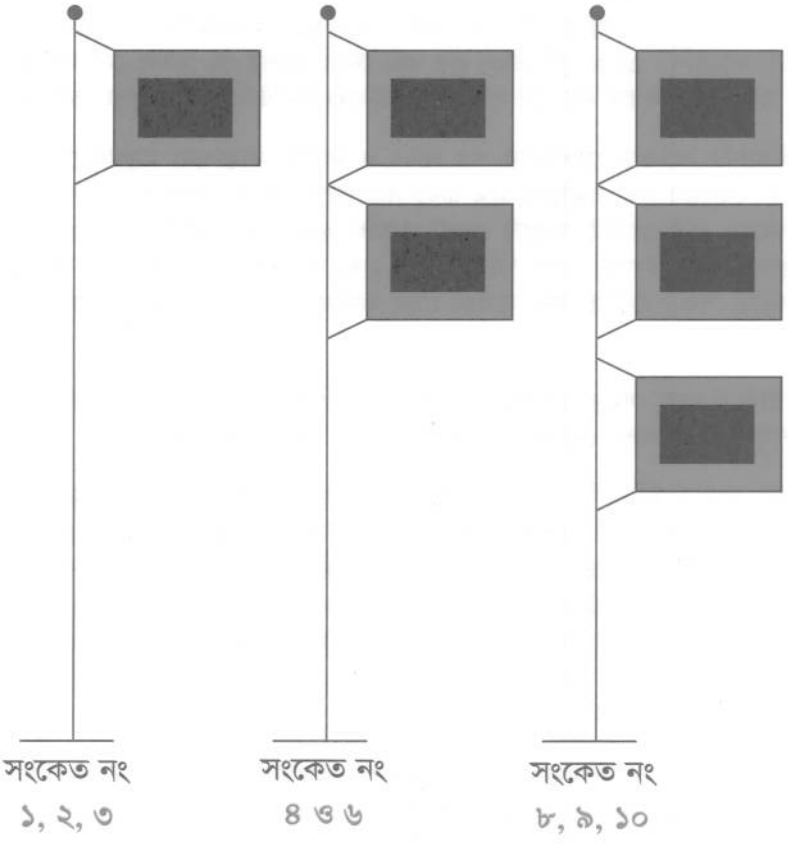

বিভিন্ন সংকেতের সময় সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি ও জনগণের করণীয়ঃ

আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সংক্রান্ত স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত নম্বর- ০৪ এর জন্য আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, নিম্নরূপ ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। ০৪ নম্বর হুশিয়ারি সংকেত ঘোষণার পর প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রতি আধাঘন্টা পর পর গণদুর্যোগ বার্তা প্রচার করতে হবে।

সতর্ক সংকেত ঘোষণার পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, জনগণের করণীয়ঃ

বর্তমানে বাতাসের প্রভাবে যেসব ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, তা হলো -

- শস্যক্ষেত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- অনেক কাঁচা এবং আধাকাঁচা ঘরবাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- সংকেত আর বাড়ানো না হলে উপকূলীয় জনসাধারণের মাঝারি ধরনের ক্ষতি হতে পারে।
- হালকা থেকে মাঝারি ধরনের ..... ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট জলোচ্ছ্বাসে .....এলাকা এবং সংশ্লিষ্ট নিম্নাঞ্চলসমূহ প্লাবিত হতে পারে।

এজন্য জনগণকে যেসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, তা হলো ঃ

- উপকূলীয় জলরাশির ঢেউ বড় ও উঁচু হয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে; যা মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহের জন্য বিপজ্জনক। উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসমূহকে উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে যাতে স্বল্প সময়ের নোটিশে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।
- ১৫০ ফুট এবং এর নিম্নের দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট যে সকল নৌ-যান ঘন্টায় ৬১ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত ঝড়ো হাওয়া প্রতিরোধে সক্ষম নয় সে সকল নৌ-যানকে অনতিবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যেতে হবে।
- জনগণকে সংকেত বাড়ানোর পূর্বে মূল্যবান সম্পদসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- শিশুদের বাইরে চলাচল ও কার্যাদি বন্ধ রাখতে হবে।
- আবহাওয়ার সর্বশেষ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি এবং দুর্যোগের গণসতর্কবার্তা জনসাধারণকে নিয়মিতভাবে শুনতে হবে এবং এ নিয়মাবলি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকলকে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সকল পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সভায় মিলিত হয়ে সম্ভাব্য সাড়াদানমূলক কার্যক্রমের সকল প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।

জনগণকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অন্য যে সকল সতর্কতামূলক কাজ করতে হবে তা নিম্নরূপঃ

(১) বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বিকলাঙ্গ, অপ্রকৃতিস্থ ও শিশুদেরকে আগে আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠাতে হবে;
(২) মহিলা বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলাকে আগেই আশ্রয়কেন্দ্রে প্রেরণ;
(৩) গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী নিরাপদ উঁচু স্থানে স্থানান্তর;
(৪) অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র এবং টাকা-পয়সা পলিথিনে মুড়ে (বাড়ির আরও দু'একজনকে জানিয়ে) মাটিতে পুঁতে রাখা;
(৫) জরুরি মুহূর্তে প্রয়োজন মেটানোর জন্য কিছু শুকনো খাবার এবং পানি পাত্রে রেখে পলিথিনে মুড়ে মাটিতে পুঁতে রাখা;
(৬) টিউবওয়েলের মাথা খুলে ওপরের খোলা মুখ শক্ত পলিথিন দিয়ে ভালভাবে মুড়ে রাখা;
(৭) ফসলের বীজ বস্তায় বা পলিথিনে বেঁধে উঁচু স্থানে রাখা অথবা অন্যত্র নিরাপদ স্থানে প্রেরণ;
(৮) মহাবিপদ সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে কালবিলম্ব না করে আশ্রয়কেন্দ্র অথবা অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া;
(৯) আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার সময় বহনযোগ্য রান্নার চুলা, মোমবাতি, দিয়াশলাই ও কিছু জ্বালানী কাঠ সঙ্গে নেয়া;
(১০) তাৎক্ষণিকভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

উপকূলীয় জেলাসমূহের এবং ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ এলাকার জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসনকে যেসব কাজ এ সময় তাৎক্ষণিকভাবে করতে হবে, তা হলোঃ

- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভা আহবান করতে হবে।
- জীবনহানি রোধ এবং ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের স্থানান্তর কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, সংকেত প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ইত্যাদির মাধ্যমে মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগ লাঘবে উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রস্তুতি নেয়া।
- বিদ্যমান ঝুঁকি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা এবং তাৎক্ষণিকভাবে ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থাদি গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা;
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু থাকবে।

এছাড়াও দুর্যোগে সৃষ্ট পরিস্থিতি তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সব ধরনের পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে ঃ-

(১) উদ্ধার ও স্থানান্তর;
(২) জরুরি চিকিৎসা;
(৩) অস্থায়ী আশ্রয়স্থল তৈরি;
(৪) নিরাপদ পানি সরবরাহ;
(৫) পয়ঃনিস্কাশন;
(৬) জরুরি খাদ্য সরবরাহ;
(৭) যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ করা;
(৮) আলো, বাতি ও জ্বালানি সরবরাহ;
(৯) ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি।

দুর্যোগ শেষে জনগণকে ব্যক্তিগতভাবে যে সব কাজ করতে হবে-

- দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া শেষ হবার সাথে সাথে আশ্রয়কেন্দ্র থেকে নিজ ঘর-বাড়িতে ফিরে যেতে হবে;
- বাড়ির আঙিনায় এবং উপযুক্ত স্থানে দ্রুত শাক-সবজির আবাদ করা;
- দ্রুত ফলনশীল ফসলের চাষ করা;
- যৌথভাবে ঘরবাড়ি মেরামত বা খাদ্যশস্যের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা;
- ত্রাণ পাওয়ার অপেক্ষায় না থেকে নিজের যা আছে তাই দিয়ে অভাব মেটানোর চেষ্টা করা;
- কাজের সন্ধান করা, প্রয়োজনে অন্যত্র যেখানে কাজ পাওয়া যায় সেখানে গমন করা;
- সাহায্যের চেয়ে কাজ প্রদানের আবেদন করা;
- ত্রাণ সাহায্য যা পাওয়া যায় তা দিয়ে অভাব মেটাবার চেষ্টা করা;
- স্বেচ্ছাসেবামূলক ও পুনর্গঠন কাজে সহযোগিতা করা।

৪ নম্বর সতর্ক সংকেতের পর যে সংকেত দেখানো হবে সেটি হবে ৬ নম্বর বিপদ সংকেত। ৬ নম্বর সতর্ক সংকেত ঘোষণার পর প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর সতর্কবার্তা প্রচার করতে হবে।

৬ নম্বর বিপদ সংকেত

৬ নম্বর বিপদ সংকেতের সময়ে কি কি ক্ষতি হতে পারেঃ

- অনেক নারিকেল গাছ ভেঙে যেতে এবং ধ্বংস হতে পারে এবং অন্যান্য অনেক বড় বড় গাছপালা উপড়ে যেতে পারে, শস্যাদি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- অধিকাংশ কাঁচা এবং আধাকাঁচা ঘরবাড়ির চালা উড়ে যেতে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। হালকা থেকে মাঝারি ধরনের পাকা ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হতে পারে।
- .....এলাকা এবং তাদের নিম্নাঞ্চলসমূহ মাঝারি ঘূর্ণিঝড়ের .....ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে ।

৬ নম্বর বিপদ সংকেতের সময়ে করণীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহঃ-

- উপকূলীয় অঞ্চলের ঢেউগুলো বড় ও মারাত্মক আকার ধারণ করবে, যা মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহের জন্য বিপজ্জনক।
- উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে অনতিবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়টি মারাত্মক আকার ধারণ করবে যা জনগণের জন্য হুমকিস্বরূপ।
- ৬ নং বিপদ সংকেতের আওতাধীন .....এলাকার জনসাধারণ নিরাপদ দালানকোঠা এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে পারে। জনগণকে সাগর উপকূল এবং নদীর তীর থেকে দূরে থাকতে হবে।
- ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু অতিক্রম করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, কারণ অতীব ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আবহাওয়ার পর হঠাৎ ভাল আবহাওয়া ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু অতিক্রম করার ইঙ্গিত করে।
- ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু অতিক্রম করার সাথে সাথেই আশ্রয় কেন্দ্রের বাহিরে যাওয়া যাবে না। কারণ কিছুক্ষণের মধ্যে প্রবল বাতাসসহ আবহাওয়া বিক্ষুব্ধ হতে পারে।
- দুর্যোগ প্রস্তুতিকরণ সংস্থাসমূহকে অবশ্যই জনগণ বিশেষ করে মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধ অসহায়দের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে এবং ইমারজেন্সি অপারেশন কেন্দ্রের সর্বশেষ নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে।
- ..... উপকূলে জোয়ার ..... টার সময় বি.এস.টি।
- .....উপকূলে ভাটা ..... টার সময় বি.এস.টি।

৬ নম্বর বিপদ সংকেতের পর যে সংকেত দেখানো হবে সেটি হবে ৮ নম্বর মহাবিপদ সংকেত। ৮, ৯ ও ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত ঘোষণার পর প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রতি ৫ মিনিট অন্তর সতর্কবার্তা প্রচার করতে হবে।

৮, ৯ ও ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত

৮, ৯ ও ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের সময়ে কি কি ক্ষতি হতে পারেঃ

- মহাবিপদ সংকেতের আওতাভূক্ত সকল এলাকা/ লোকালয় খুবই মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
- অসংখ্য নারিকেল এবং অন্যান্য বড় গাছ-পালা ধ্বংস হতে বা উপড়ে পড়তে পারে।
- শস্যক্ষেত্রসমূহ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।
- সকল কাঁচা ও আধাকাঁচা ঘরবাড়িসমূহ ধ্বংস হতে পারে। হালকা থেকে মাঝারি ধরনের পাকা ঘরবাড়ি উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।
- ..... এলাকা এবং তাদের নিম্নাঞ্চলসমূহে .....ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে ।

৮, ৯ ও ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের সময়ে করণীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহঃ-

- উপকূলীয় অঞ্চলের ঢেউগুলো খুব বড় ও মারাত্মক আকার ধারণ করবে, যা মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহের জন্য বিপজ্জনক। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।
- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও নিরাপদ দালান কোঠায় অনতিবিলম্বে জনসাধারণকে স্থানান্তর করতে হবে।

- মহাবিপদ সংকেত নম্বর ৮ (পুন) ৮ এর আওতাভূক্ত সকল এলাকা এবং বন্দরসমূহ অগ্রসরমান ঘূর্ণিঝড়ের অবিরাম বর্ধিত গতির বাতাস প্রবাহিত হবে। এই ৮ নং মহাবিপদ সংকেতের আওতাধীন কোন এলাকার উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র অতিক্রম করতে পারে, অতিক্রমরত ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং হঠাৎ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আবহাওয়ার উন্নতি দেখলেই নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করা যাবে না।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থাসমূহকে পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত থাকতে হবে এবং ইমারজেন্সি অপারেশন কেন্দ্রের সর্বশেষ নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে।
- .....উপকূলে জোয়ার .....টার সময় বি.এস.টি।
- .....উপকূলে ভাটা .....টার সময় বি.এস.টি।

মহাবিপদ সংকেতের দুর্যোগের সময় জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে যেসব জরুরি ব্যবস্থা নিতে হবে, তা হলোঃ-

- দুর্যোগকালে উপজেলা ও ইউনিয়নের সুবিধামতো স্থানে উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে পৃথক পৃথক 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' স্থাপন করতে হবে।
- উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভায় পৌরসভা চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়নে চেয়ারম্যান 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' এর সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন এবং 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একাধিক সদস্য ও অন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দিতে হবে।
- ওয়ার্ড সাব-কমিটির সাথে উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- জননিরাপত্তা ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রয়োজনে উপজেলা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে পুলিশের অথবা স্বেচ্ছাসেবক দলের ব্যবস্থা করতে হবে।
- গ্রাম প্রতিরক্ষা, ইউনিয়ন চৌকিদার ও আনসারদের দ্বারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জানমালের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব নিতে হবে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনাঃ

- মহিলা এবং পুরুষরা কে কোথায় থাকবেন আশ্রয়কেন্দ্রে আসা মাত্র তা জনগণকে জানানো।
- অসুস্থদের আশ্রয়কেন্দ্রে সহায়তাদান।
- গর্ভবতী মহিলাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা দিতে হবে।
- খাবার পানির ব্যবস্থা রাখা।
- আলোর ব্যবস্থা রাখা।
- আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাপত্তার প্রতি নজর রাখা।
- মহিলাদের জন্য ভিন্ন শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।

সিপিপি কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের দায়িত্বঃ

- ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান সম্পর্কে জানা এবং তা ধারাবাহিকভাবে জনগণকে জানানো।
- সংকেত অনুযায়ী আশ্রয় কেন্দ্রের ছাদে পতাকা উত্তোলন।
- জনগণকে সতর্ক করার জন্য হ্যান্ড মাইক এবং সাইরেন ব্যবহার করা।
- জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যেতে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান।
- আবহাওয়া শান্ত হওয়ার সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ব্যবস্থাপকের নির্দেশনা অনুসারে বা নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত উদ্ধার এলাকার উপযোগী উদ্ধার পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল গ্রহণ।

বিশেষ কোন পরিস্থিতি স্বেচ্ছাসেবক দলের পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব না হলে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করতে হবে।

জনগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে দুর্যোগের এ বিশেষ গণসতর্কবার্তা যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পর্বে সাধারণভাবে করণীয়ঃ

- দুর্যোগ হতে পারে এমন মাসগুলিতে জনগণকে দুর্যোগ সম্বন্ধে সতর্ক ও সচেতন করুন।
- করণীয় বিষয়ে নিজে অবহিত হোন এবং পরিবার ও সমাজের অন্যান্য সকলে যাতে জানতে পারে সে বিষয়ে সচেষ্ট হোন।
- দুর্যোগের সময় কোন এলাকার লোক কোন আশ্রয়ে যাবে, গরু মহিষাদি কোথায় থাকবে তা আগে ভাগেই ঠিক করে রাখুন এবং ম্যাপে চিহ্নিত করে রাখুন।
- বাড়িতে, গ্রাম, রাস্তায় ও বাঁধের উপর গাছ লাগান।
- যথাসম্ভব উঁচু স্থানে শক্ত করে ঘর তৈরী করুন। পাকা ভিত্তির উপর লোহার বা কাঠের পিলার এবং ফ্রেম দিয়ে তার উপর ছাউনি দিন। ছাউনিতে টিন ব্যবহার না করা ভাল। কারণ ঝড়ের সময় টিন উড়ে মানুষ ও গবাদি পশুকে আহত করতে পারে। তবে ০.৫ মিঃ মিঃ পুরুত্ব বিশিষ্ট টিন ও জেহুক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- উঁচু জায়গায় টিউবওয়েল স্থাপন করুন, যাতে জলোচ্ছ্বাসের লোনা ও ময়লা পানি টিউবওয়েলে ঢুকতে না পারে।
- টিউবওয়েল স্থাপনের পূর্বে আর্সেনিক পরীক্ষা করে নিতে হবে।
- জেলে-নৌকা, লঞ্চ ও ট্রলারে রেডিও রাখুন। সকাল, দুপুর ও বিকালে আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনার অভ্যাস করুন।
- সম্ভব হলে বাড়িতে কিছু প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম (ব্যান্ডেজ, ডেটল প্রভৃতি) রাখুন।
- জলোচ্ছ্বাসের পানির প্রকোপ থেকে রক্ষায় নানারকম শস্যের বীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিন।
- বাড়িতে এবং রাস্তায় নারিকেল, কলাগাছ, বাঁশ, তাল, কড়াই ও অন্যান্য শক্ত গাছপালা লাগান। এসব গাছ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের বেগ কমিয়ে দেয়। এর ফলে মানুষ দুর্যোগের কবল থেকে বাঁচতে পারে।
- নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকেরই সাঁতার শেখা উচিত।
- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে বা অন্য আশ্রয়ে যাবার সময় কি কি জরুরি জিনিস সঙ্গে নেয়া যাবে এবং কি কি জিনিস মাটিতে পুঁতে রাখা হবে তা ঠিক করে সে অনুসারে প্রস্তুতি নেয়া উচিত।
- আর্থিক সামর্থ থাকলে ঘরের মধ্যে একটি পাকা গর্ত করুন। জলোচ্ছ্বাসের পূর্বে এই পাকা গর্তের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখতে পারবেন।
- ডায়রিয়া মহামারীর প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে। শিশুদের ডায়রিয়া হলে কিভাবে খাবার স্যালাইন তৈরি করতে হবে সে বিষয়ে পরিবারের সকলকে প্রশিক্ষণ দিন।

- ঘূর্ণিঝড়ের মাসগুলিতে বাড়িতে কিছু শুক্না খাবার (মুড়ি, চিড়া, বিস্কুট প্রভৃতি) রাখা ভাল।
- নোংরা পানি কিভাবে ফিটকারি বা ফিল্টার দ্বারা খাবার ও ব্যবহারের উপযোগী করা যায় সে বিষয়ে মহিলাদের ও আপনার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিন।
- ঘূর্ণিঝড়ের পরে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করুন। বৃষ্টির পানি বিশুদ্ধ। মাটির বড় হাড়ি বা ড্রামে পানি রেখে তার মুখ ভালভাবে আটকিয়ে রাখতে হবে যাতে পোকা-মাকড়, ময়লা-আবর্জনা ঢুকতে না পারে।

পূর্বাভাস পাবার পর দুর্যোগকালে করণীয়ঃ

- আপনার ঘরগুলির অবস্থা পরীক্ষা করুন, আরও মজবুত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। যেমন মাটিতে খুঁটি পুঁতে দড়ি দিয়ে ঘরের বিভিন্ন অংশ বাঁধা।
- সিপিপি এর স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রস্তুতি নিন।
- বিপদ সংকেত পাওয়া মাত্র বাড়ির মেয়ে, শিশু ও বৃদ্ধদের আগে নিকটবর্তী নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছিয়ে দিতে প্রস্তুত হোন এবং অপসারণ নির্দেশের পরে সময় নষ্ট না করে দ্রুত আশ্রয়কেন্দ্রে যান।
- বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় আগুন নিভিয়ে যাবেন।
- আপনার অতি প্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্যসামগ্রী যেমন- ডাল, চাল, ম্যাচ, শুক্না কাঠ, পানি, ফিটকিরি, চিনি, নিয়মিত ব্যবহৃত ঔষধ, বইপত্র, ব্যান্ডেজ, তুলা, ওরস্যালাইন ইত্যাদি পানি নিরোধক প্লাষ্টিক কাগজের বা কাপড়ের ব্যাগে ভরে গর্তে রেখে ঢাকনা দিয়ে পুঁতে রাখুন।

- আপনার গরু-ছাগল নিকটস্থ উঁচু বাঁধে অথবা কিল্লা বা উঁচু স্থানে রাখুন। কোন অবস্থায়ই গোয়াল ঘরে বেঁধে রাখবেন না। কোন উঁচু জায়গা না থাকলে ছেড়ে দিন, বাঁচার চেষ্টা করতে দিন।
- শক্ত গাছের সাথে কয়েক গোছা লম্বা মোটা শক্ত রশি বেঁধে রাখুন। রশি ধরে অথবা রশির সাথে নিজেকে বেঁধে রাখুন যাতে প্রবল ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিতে না পারে।
- আশ্রয় নেয়ার জন্য নির্ধারিত বাড়ির আশেপাশে গাছের ডালপালা আসন্ন ঝড়ের পূর্বেই কেটে রাখুন, যাতে ঝড়ে গাছগুলি ভেঙে বা উপড়ে না যায়।
- রেডিওতে প্রতি ১৫ মিনিট পর পর ঘূর্ণিঝড়ের খবর শুনতে থাকুন।

- দলিলপত্র ও টাকা-পয়সা পলিথিনে মুড়ে নিজের শরীরের সঙ্গে বেঁধে রাখুন অথবা সুনির্দিষ্ট স্থানে পরিবারের সদস্যদের জানিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখুন।
- টিউবওয়েলের মাথা খুলে পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং টিউবওয়েলের খোলা মুখ পলিথিন দিয়ে ভালভাবে আটকে রাখতে হবে যাতে ময়লা বা লবনাক্ত পানি টিউবওয়েলের মধ্যে প্রবেশ না করতে পারে।

দুর্যোগ পরবর্তী করণীয়ঃ

- রাস্তা-ঘাটের উপর উপড়ে পড়া গাছপালা সরিয়ে ফেলুন যাতে সহজে সাহায্যকারী দল আসতে পারে এবং দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব হয়।
- আশ্রয়কেন্দ্র হতে মানুষকে বাড়ি ফিরতে সাহায্য করুন এবং নিজের ভিটায় বা গ্রামে অন্যদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিন।
- অতি দ্রুত উদ্ধার দল নিয়ে খাল, নদী, পুকুর ও সমুদ্রে ভাসা এবং বনাঞ্চলে বা কাদার মধ্যে আটকে পড়া লোকদের উদ্ধার করুন।
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ যাতে শুধু এনজিও বা সরকারি সাহায্যের অপেক্ষায় বসে না থেকে নিজেকে সাহায্য করে সে বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে।

- রিলিফের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সচেষ্ট হোন। রিলিফের পরিবর্তে কাজ করুন। রিলিফের পরিবর্তে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। রিলিফ যেন মানুষকে কর্মবিমুখ না করে কাজে উৎসাহি করে সেভাবে রিলিফ বিতরণ করতে হবে।
- দ্বীপের বা চরের নিকটবর্তী কাদার মধ্যে আটকে পড়া লোকদের উদ্ধারের জন্য দলবদ্ধ হয়ে দড়ি ও নৌকা নিয়ে লোক উদ্ধার করুন। কাদায় আটকে পড়া লোকের কাছে দড়ি বা বাঁশ পৌঁছে তাকে উদ্ধার কাজে সাহায্য করা যায়।
- ঝড় একটু কমলেই ঘর থেকে বের হবেন না। পরে আরও প্রবল বেগে অন্যদিক থেকে ঝড় আসার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- পুকুরের বা নদীর পানি সিদ্ধ করে পান করুন। বৃষ্টির পানি ধরে রাখুন।
- নারী, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ লোকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় ত্রাণ বন্টন (আলাদা লাইনে) করুন।
- দ্রুত উৎপাদনশীল ধান ও শাক-সবজির জন্য জমি প্রস্তুত করুন, বীজ সংগ্রহ করুন এবং কৃষি কাজ শুরু করুন যাতে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফসল ঘরে আসে।

অন্যান্য আপদ ও দুর্যোগে জনগণের করণীয়

ঘূর্ণিঝড় ছাড়াও বাংলাদেশকে প্রায়শই বন্যা, ভূমিকম্প, টর্নেডো ও কালবৈশাখী, নদী ভাঙন, সুনামি, আর্সেনিক দূষণ, অগ্নিকাণ্ড, সাপে কাটা, হেপাটাইটিস বা জন্ডিস, রক্তক্ষরণ, বজ্রপাত, ভূমিধস, আকস্মিক বন্যা বা পাহাড়ি ঢল, জলাবদ্ধতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খরাসহ বিভিন্ন ধরনের আপদ ও দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার ক্ষেত্রে আগাম সতর্ক সংকেত দেয়া সম্ভব হলেও ভূমিকম্প, টর্নেডো, কালবৈশাখী প্রভৃতি আপদ বা দুর্যোগের ক্ষেত্রে পূর্বাভাস এখনও দেয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি। তবে এ সকল দুর্যোগের ক্ষেত্রে আগাম প্রস্তুতি ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। বন্যা মোকাবিলার করণীয়সহ অন্যান্য দুর্যোগের সময় জনগণের করণীয় সম্পর্কিত তথ্যাদি একে একে তুলে ধরা হলো।

বন্যা

ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান এমন এক জায়গায় যেখান থেকে বন্যার আশংকা একেবারে নির্মূল করা যাবে না। অবিরাম ও অতিবৃষ্টি এবং উজান থেকে নেমে আসা ঢল, নদীর নাব্যতা হ্রাস ইত্যাদি কারণে বন্যা হয়ে থাকে।

পূর্ব-প্রস্তুতিঃ

- নতুন জেগে ওঠা চরে বসতবাড়ি নির্মাণ করবেন না, বন্যা হলে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- আপনার ঘরের মেঝে স্বাভাবিক উচ্চতার চেয়ে বেশি উঁচু করে নির্মাণ করুন, যাতে বন্যার পানি ঘরে না উঠে।
- গাছপালা আমাদের ফল দেয়, কাঠ দেয়, পরিবেশ দূষণ রোধ করে এবং বন্যাজনিত মাটির ক্ষয়রোধ করে। আপনার বাড়ির আশেপাশে কলাগাছসহ অন্যান্য গাছপালা বেশি করে লাগান, যাতে বন্যার পানির তোড়ে আপনার ভিটে বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
- বন্যাপ্রবণ এলাকায় ঘরের চারপাশ মাটি দিয়ে নির্মাণ না করে সম্ভব হলে ইট-সিমেন্ট দিয়ে পাকা করুন, যাতে ঘরের ভিত ভেঙে না পড়ে।
- আপনার টিউবওয়েল উঁচু স্থানে স্থাপন করুন, যাতে বন্যার পানিতে ডুবে না যায়, বা বন্যার সময় টিউবওয়েল উঁচু করার ব্যবস্থা রাখুন।
- আপনার বাড়িতে বন্যার পানি উঠলে আপনি কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করবেন বা মালপত্র স্থানান্তর করবেন তা পূর্বেই ঠিক করে রাখুন।
- গবাদিপশু মূল্যবান সম্পদ, এদের রক্ষা করার জন্য কি করবেন, বন্যার মৌসুম আসার আগে তা ঠিক করে রাখুন।
- বন্যার মাসগুলিতে বাড়িতে মুড়ি, চিড়া, গুড় ইত্যাদি শুকনা খাবার কিছু পরিমাণে মজুদ রাখুন।
- ছেলেমেয়ে সবাইকে সাঁতার শিখান।

- আপনার এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি বা স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করুন।
- বন্যা কবলিত হওয়ার আশংকা আছে এমন পুকুর, দিঘি, ঘেরের নিচু পাড় উঁচুকরণ। সম্ভব হলে জাল দিয়ে ঘিরে রাখা যেতে পারে।
- যেসব পুকুর, দিঘি, ঘেরের ক্ষতিরোধ করা সম্ভব হবে না সে ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে মাছ ধরে বিক্রি করা যেতে পারে।

বন্যাকালীন করণীয় ঃ

- বন্যার সময় ঠান্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।
- বন্যায় যদি বাড়িঘর ডুবে যায়, নিকটস্থ কোন উঁচুস্থানে বা বাঁধে অথবা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করুন।

- নিজ বসতবাড়িতে অবস্থান করা সম্ভব না হলে, বাড়ির কাছাকাছি কোথাও অবস্থান করুন। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ঘরের চালের নিচে পাটাতনে রাখার ব্যবস্থা করুন।
- কোন মতেই দালাল ও টাউটদের পরামর্শ শুনে নিজ গ্রাম ছেড়ে পরিবার পরিজনসহ শহরে যাবেন না। নিজ গ্রামে থাকা কোন মতেই সম্ভব না হলে, পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে, যা বন্যাকবলিত নয়, আশ্রয় গ্রহণ করুন বা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থাপিত আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করুন।
- টিউবওয়েলের পানি পান করুন। টিউবওয়েলের পানি পাওয়া না গেলে পানি ফুটিয়ে পান করুন অথবা পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বা ফিটকিরি ব্যবহার করুন।

- বন্যার সময় বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে। এগুলির প্রতিষেধক টিকা বা ইনজেকশন গ্রহণ করুন।
- আপনার এলাকায় কার্যরত মেডিকেল টিমের অবস্থান সম্বন্ধে জেনে নিন এবং প্রয়োজনে তাদের সাহায্য নিন।
- আপনার ঘরে রক্ষিত কার্বলিক এসিডের বোতলের ছিপি খুলে রাখুন। এতে সাপ আপনার ঘরে ঢুকবে না। তাছাড়া কার্বলিক এসিড মিশ্রিত সাবান টুকরো ঘরের চারকোনে ছিটিয়ে রাখলে ঘরে সাপ ঢুকবে না।
- সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ বন্টনকারীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করুন।
- ত্রাণসামগ্রী যা পাওয়া যায়, তা দিয়ে অভাব মিটানোর চেষ্টা করুন।
- বন্যার পরই বন্যাকবলিত জমিতে কি ফসল ফলানো যায়, তার চিন্তাভাবনা করুন বা এ বিষয়ে কৃষি কর্মীদের সাথে আলোচনা করুন।
- বন্যাকবলিত এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ করতঃ প্রতিটি বন্যা কবলিত গ্রামের নিরাপত্তা রক্ষার্থে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করুন এবং সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।
- ফসলের বীজ নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
- বন্যাপ্লাবিত পুকুর বা দিঘিতে ডাল-পালা ফেলে মাছ ধরে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বন্যা পরবর্তী করণীয়ঃ

- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে নিজ ভিটা বাড়িতে ফিরে যান, ঘরবাড়ি বসবাসযোগ্য করুন এবং বাড়িতে নানা ধরনের শাকসবজি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করুন।
- নিজ জমি চাষাবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করুন। কৃষি কর্মীদের সাথে আলোচনাক্রমে স্বল্প সময়ে উৎপাদনযোগ্য ফসলের চাষ করুন।
- এককভাবে ঋণের চেষ্টা না করে যৌথভাবে ঋণ গ্রহণের প্রচেষ্টা চালালে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।
- বন্যার পর পরই নানা রকম রোগ (টাইফয়েড, ডায়রিয়া, আমাশয় ইত্যাদি) দেখা দিতে পারে। তাই রোগ প্রতিষেধক টিকা বা ইনজেকশন নিন।
- ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণে সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করুন।

- ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণের জন্য কোন সরকারি সাহায্য (টিন) পাওয়া যাবে কিনা সে সম্বন্ধে ইউ.পি. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখুন। এ ব্যাপারে যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালালে ভাল হবে।
- বন্যার পানি নামার সাথে সাথে ক্ষতিগ্রস্ত দিঘি বা ঘেরের পাড় মেরামত করে পুকুরে জাল টেনে চাষকৃত মাছ আছে কিনা দেখে পরবর্তীতে শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করে পুনরায় মাছের পোনা ছেড়ে চাষ শুরু করা যেতে পারে।
- প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে, সম্ভব হলে মাছ চাষের জন্য ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যে মৎস্য কর্মকর্তার সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত রোপা আমন ধানের বীজতলা পানি দিয়ে পাতায় জমে থাকা পানি বা কাদা ধুয়ে দেয়া যেতে পারে এবং পাতা শুকানোর পর কিছু ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- রোপা আমন ধানের চারার সংকট হলে ইতিপূর্বে রোপনকৃত ভাল জমি থেকে প্রতি গোছার দু'একটি কুশি ভেঙে নতুন জমিতে রোপন করা যেতে পারে।
- বীজ ও চারার সন্ধানে স্থানীয় উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (এসএসও)-র সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ভূমিকম্প

জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্ব, বিল্ডিংসমূহের মধ্যবর্তী সরু পথ, অপরিকল্পিত ও পুরানো বিল্ডিংবহুল অঞ্চল, কাদা ও পাথরের তৈরি নির্মাণ পদ্ধতির চর্চা, বাড়ির উপরের তলা ও ছাদের ভর বেশি এমন বাড়ির আধিক্য ইত্যাদি ধরনের অঞ্চলে সাধারণত ভূমিকম্পে হতাহতের হার বেশি হয়ে থাকে। ভূমিকম্পের আগাম আভাস দেয়া সম্ভব নয়। তবে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমানো যায় যদি জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। এ ব্যাপারে সরকার, এনজিও, গণমাধ্যম কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। জনগণকে ভূমিকম্পের সময় সম্পর্কে পূর্ব থেকেই জ্ঞানলাভ করা দরকার।

ভূমিকম্প থেকে প্রাণ রক্ষায় জনগণকে পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে যা করতে হবেঃ

- ভূ-গর্ভস্থ প্লেটের যেসব প্রান্তে ভূকম্পন শক্তি সঞ্চয় করে তার মানচিত্র তৈরি করে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা সম্পর্কে জনগণকে ধারণা দিতে হবে।
- ভূমির নিত্য কম্পনের উপাত্ত সংগ্রহ করে বিদ্যমান জাতীয় বিল্ডিং কোড সংস্কার, আধুনিকায়ন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- বাড়ি তৈরির আগে ঐ অঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা, একটিভ ফল্ট, ভূমির গঠন ইত্যাদির ব্যাপারে খোঁজ নিন। ভূমিধস অঞ্চলে বাড়ি তৈরিতে সাবধান হন।
- বাড়ির বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে ভেতরের গঠন ও ভিত শক্ত করুন। বাড়ি তৈরির পূর্বে বাড়ির নক্সা-প্রকৌশল সম্পর্কে নিশ্চিত হন। প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পরীক্ষা করান।

- বাড়ির অপেক্ষাকৃত মজবুত স্থান, দরজাপথ, শক্ত টেবিল বা ডেস্ক সনাক্ত করে রাখুন যাতে প্রয়োজনে এগুলোর নিচে আশ্রয় নেয়া যেতে পারে।
- উঁচু বাড়ির কাছাকাছি থাকলে বাড়ির কার্নিস, রেলিং, ব্যালকনি ও খোলা সিঁড়ি ইত্যাদি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকুন; কেননা ভূমিকম্পে এগুলো ধসে পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে।
- গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা যেমন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, হাসপাতাল, শিল্প-কলকারখানার অবকাঠামো নিয়মিত পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- ব্যাটারিচালিত রেডিও, টর্চলাইট এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম বাড়িতে রাখুন।
- সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে ভূমিকম্প সম্পর্কিত যেকোন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করুন এবং অপরকে অংশগ্রহণ করতে বলুন।
- তৃণমূল পর্যায়ে ভূমিকম্প বিষয়ক তৈরিকৃত বিভিন্ন ডকুমেন্টারী ছবি প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- অন্যান্য দেশের ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলার কৌশল বিষয়ক অভিজ্ঞতা এ দেশের প্রচার মাধ্যমে ঘন ঘন প্রচারের ব্যবস্থা করা।

- উদ্ধারকারী দলগুলোর জন্য উন্নতমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- তৃণমূল পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা।
- সঠিক নিয়মে তথ্য প্রদানে অবহেলা বা গড়িমসি করলে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখা।
- পারিবারিক পর্যায়ে প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে সক্রিয়করণের জন্য উদ্যোগ নেয়া।
- জাতীয় পর্যায়ের কমিটি পুর্নগঠন করা।
- বিভিন্ন সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপের মাধ্যমে জনগণকে সম্পৃক্ত করে ভূমিকম্প বিষয়ে জনগণকে সঠিকভাবে অবহিত করা।

ভূমিকম্পের সময় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে জনগণের করণীয়ঃ

- ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কিত হবেন না- মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন;
- কলাম দেয়া পাকা ঘরে কলামের সঙ্গে সঙ্গে গোড়ায় আশ্রয় নিন;
- ষ্টিলের আলমারী, শো-কেস, কাঁচের আসবাবপত্র ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন;
- উপর তলায় থাকলে কম্পন বা ঝাঁকুনি পর্যন্ত অপেক্ষা করুন; লাফ দিয়ে নামার চেষ্টা করবেন না;
- কম্পন বা ঝাঁকুনি থামলে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ুন;
- দ্রুত বৈদ্যুতিক ও গ্যাস সুইচ বন্ধ করুন ও আগুন নিভান;
- সম্ভব হলে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ুন ও খোলা জায়গায় আশ্রয় নিন;
- পাকা ভবন, দেয়াল, বড় গাছ, বৈদ্যুতিক খুঁটি ইত্যাদি থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিন;
- ঝাঁকুনির সময় বের হওয়া সম্ভব না হলে শক্ত টেবিল অথবা ডেস্কের নিচে আশ্রয় নিন;
- ইটের গাঁথুনির পাকা ঘর হলে ঘরের এক কোণে আশ্রয় নিন;
- আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিন ও দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করুন;

ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে জনগণের করণীয়ঃ

- ভূমিকম্প পরবর্তী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেড গঠন, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক উপকরণের ব্যবস্থাকরণ।
- দুর্যোগোত্তর শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও লুটতরাজ বা চুরি ডাকাতির সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত এবং ত্রাণ ও জরুরি কর্মকান্ডে ব্যবহারের জন্য জল সম্পদ, ব্যাক্তি মালিকানাধীন বাড়ী, খোলা জায়গা, গাড়ি, নৌ-যান ও অন্যান্য সম্পত্তি প্রয়োজনে অস্থায়ীভাবে সরকারি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের সহায়তা করা উচিত।

- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের তালিকাভূক্ত স্বেচ্ছাসেবকদের শহর এলাকায় ভূমিকম্প পরবর্তীতে অনুসন্ধান, উদ্ধার ও পুনর্বাসন কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে।
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা।

টর্নেডো ও কালবৈশাখী

টর্নেডো ঘূর্ণি বাতাসের সাথে বজ্র মেঘসহ হাতির শুঁড়ের ন্যায় ঘূর্ণায়মান আকারে ভূমিতে আঘাত হানে। এর সৃষ্টিকাল, স্থায়িত্ব ও ব্যাপ্তি স্বল্প সময়ে ও স্থানীয় প্রকৃতির হওয়ায় টর্নেডোর পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হয় না। তবে ক্ষয়ক্ষতি কখনো কখনো কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। সাধারণত চৈত্র মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে টর্নেডো সংঘটিত হয়ে থাকে। বৈশাখ মাসে কালবৈশাখী যা টর্নেডোর মতো ভয়াবহ ঝড় সবচেয়ে বেশি হয়। কখনো কখনো অস্বাভাবিকভাবে দ্রুত শীতের সমাপ্তির কারণে ফাল্গুন মাসের শেষের দিকেও টর্নেডো বা কালবৈশাখী হয়ে থাকে।

টর্নেডো মাত্র কয়েক মিনিটেই প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে ঘর-বাড়ি, গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটিসহ যে কোন শক্ত অবকাঠামো ধ্বংস করে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ও জীবনহানি ঘটাতে পারে।

টর্নেডো ও কালবৈশাখীর সময়ে জনগণের করণীয়ঃ

- কালবৈশাখী ঝড়ের আভাস পাওয়া গেলেই রেডিও-তে প্রচারিত আবহাওয়া বার্তা শোনা ও ঝড়ের গতি প্রকৃতির উপর জনগণকে নজর রাখতে হবে।
- হাতির শুঁড়ের ন্যায় মেঘ দেখতে পেলেই দ্রুত পরিবারের সকলকে সতর্ক করে নির্দিষ্ট শক্ত খাট-পালঙ্কের নিচে, নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়ার প্রস্তুতি রাখা।
- বাড়ির আঙিনায়, আশপাশের ভারী জিনিসপত্র, কাঠ, টিন, চাষের যন্ত্রপাতি, লোহা ইত্যাদি খোলা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে না রাখা।
- বাড়ির কাছাকাছি গাছপালার ডাল কেটে-ছেঁটে বাড়িকে মুক্ত করে রাখুন।

টর্নেডো যেহেতু স্থানীয় পরিসরে সংঘটিত হয়ে থাকে, তাই টর্নেডো শেষ হলেই এর ক্ষয়ক্ষতি ও অন্যান্য বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন, উদ্ধারকারী ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে যত দ্রুত সম্ভব অবহিত করা এবং নিজ এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন টর্নেডোর ক্ষয়ক্ষতি কমাতে কার্যকর অবদান রাখতে পারে।

নদী ভাঙন

বাংলাদেশে নদী ভাঙন অন্যান্য আকস্মিক ও প্রলয়ংকরী দুর্যোগের চেয়ে কম বিপজ্জনক নয় বরং কোথাও কোথাও এটি অধিক ধ্বংসাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। নদী ভাঙনে যে হারে লোকজন নিঃস্ব হয়, পুনর্বাসনের হার সেই তুলনায় কম। তাই ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে ও পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। নদী ভাঙনের ফলে যারা জমিজমা ও সম্পদ হারান, তারা এক রাতের মধ্যেই স্বচ্ছল অবস্থা থেকে চরম দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হন।

নদীর গতিপথ পরিবর্তন, আকস্মিক বন্যা, মাটির দুর্বল গঠন ও নদী ভরাট, অতিরিক্ত বৃষ্টি, বৃক্ষহীন নদীর পাড় ও অপরিকল্পিত বাধ নির্মাণ ইত্যাদি কারণে এবং পানির চাপে ও আঘাতে নদীর পাড়ে ভাঙন হয়।

নদী ভাঙনরোধে করণীয়ঃ

- নদীতে ভেঙে যাওয়া (সিকস্তি) ও জেগে ওঠা (পয়স্তি) জমি সংক্রান্ত ভূমি আইন সম্পর্কে নিজে জেনে ও অপরকে জানিয়ে নদী ভাঙন মোকাবিলায় মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।
- নদী ভাঙন দূর্গতদের মধ্যে নারী ও শিশুরা নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়। নারীরা হামলা, অপহরণ ও পাচার, উপদ্রব ও নির্যাতনের শিকার যাতে না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত।
- মারাত্মক ভাঙন কবলিত এলাকায় এমনভাবে ঘর-বাড়ি তৈরি করা উচিত যাতে প্রয়োজনের সময় সহজে খুলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরিয়ে নিয়ে বাড়ি পুনর্নির্মাণ করা যায়।
- ভাঙনপ্রবণ বা ভাঙনের ঝুঁকি আছে এমন জায়গায় স্থায়ী পাকা কাঠামো বা ভবন নির্মাণ করা উচিত নয়।
- ছোট নদীর ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে ভাঙন ঠেকানোর উদ্যোগ নেয়া যায় তবে বড় নদীর ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি কমের মধ্যে থাকতেই অন্যত্র সরে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়া উচিত।

- নদী ভাঙন এলাকায় ভাঙনের গতি-প্রকৃতি, ভাঙনের ইতিহাস, তীব্রতা ও প্রকৃতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা উচিত এবং ভাঙনের সময় স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে দুর্গতদের নিরাপত্তা বিধানকল্পে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা যেতে পারে।
- নদী ভাঙনপ্রবণ এলাকায় গাছ লাগানো যেতে পারে।
- নদীর উৎস মুখের দু'পাশে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে, এতে মাটির ক্ষয়রোধ হবে এবং পলি মাটির প্রবাহ কমবে।
- গাছপালা ও বনাঞ্চল উজাড় না করার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

সুনামি

সমুদ্রতলে তীব্র ও অগভীর ভূমিকম্প, সামুদ্রিক ভূমিধস ইত্যাদি কারণে সামুদ্রিক বড় ঢেউয়ের সিরিজ আকারে সুনামি সৃষ্টি হয়। সমুদ্রতলের পানির উচ্চতার অস্বাভাবিক পরিবর্তন, সামুদ্রিক বিকট গর্জন ধ্বনি এবং সমুদ্র নিকটবর্তী যে কোন ভূমিকম্পের পর পরই সুনামি সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন থাকতে হবে।

সুনামি একটি বিরল প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কিন্তু এর ধ্বংসলীলা ব্যাপক। সুনামি আসলে ভূমিকম্পজনিত সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। বিশ্বের ভূমিকম্পপ্রবণ দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। গত ২ হাজার বছরে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সংঘটিত সুনামিতে ৪ লাখ ৬২ হাজার মানুষ মারা গেছে। এসব সুনামির শতকরা ৮২ ভাগ সংঘটিত হয় ভূমিকম্প থেকে। বাকিগুলোর কারণ ছিল ভূমিধস, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত প্রভৃতি।

সুনামি সংকেত পাওয়ার উপায়ঃ

- বিশ্ব সুনামি সতর্ককরণ ব্যবস্থা হাওয়াই থেকে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ এ সংস্থার আওতাধীন ভারত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্ক পদ্ধতির সদস্য হয়েছে এবং বাংলাদেশ এখান থেকে সুনামি সংক্রান্ত তথ্য পেয়ে থাকে।
- গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, সুনামির সময় হাতি, চিতাবাঘ, শিয়াল, হরিণ, কুমির এবং কবুতর আগেই বুঝতে পেরে নিরাপদ দুরত্বে সরে যেতে সক্ষম হয়েছিল। আমরা প্রকৃতির এ প্রাণীর আচরণ পরীক্ষা করেও সুনামির সংকেত বুঝতে পারি। জীবজন্তুর ও প্রকৃতির ভাষা অনুধাবনে এবং প্রথাগত জ্ঞান কাজে লাগাতে গবেষণা অব্যাহত রাখতে হবে।

সুনামির পূর্ব-প্রস্তুতিঃ

- বিভিন্ন সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপের মাধ্যমে জনগণকে সম্পৃক্ত করে সুনামি বিষয়ে জনগণকে সঠিকভাবে অবহিত করা।
- উদ্ধারকারী দলগুলোর জন্য উন্নতমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- তৃণমূল পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা।
- পরিবারিক পর্যায়ে প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে সক্রিয়করণের জন্য উদ্যোগ নেয়া।
- জাতীয় পর্যায়ের কমিটি পুর্নগঠন করা।

সুনামির সময় করণীয়ঃ

- আমাদের দেশের উপকূলে যে আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে সেখানে সুনামি-ভূমিকম্পের সংকেত পেলে জনগণ আশ্রয় নিতে পারে।
- সুনামিতে যেহেতু জলোচ্ছ্বাস হয় পানি বাড়তে একটু সময় লাগে, জনগণকে পানি বাড়ার পূর্বে দ্রুত সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা যায়।
- সুনামিতে দেখা গেছে, পুরুষের তুলনায় শিশু ও মহিলার মৃত্যু সংখ্যা প্রায় চারগুণ, তাই পূর্বপ্রস্তুতি ও উদ্ধার প্রক্রিয়ায় তাদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে সর্বাগ্রে।

সুনামির পর করণীয় ঃ

- সুনামি আঘাত হানার পর দ্রুত উদ্ধার কাজ পরিচালনা করতে হবে। সরকারি, বেসরকারি এনজিও, আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা, দাতাগোষ্ঠী সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হবে।
- দূর্গতদের দ্রুত পুনরুদ্ধার, খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ, সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া পুনর্বাসন কাজও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা।

আর্সেনিক দূষণ

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ দেখা দিয়েছে। দেশের প্রায় ৫৯ টি জেলায় আর্সেনিক দূষণ ধরা পড়েছে। এ রোগ হলে হাতে পায়ে আঁচিলের মত গোটা হয় এবং তা ধীরে ধীরে বড় হয়। এতে ত্বকে ক্যান্সার হতে পারে।

আর্সেনিক দূষণ থেকে রক্ষার জন্য যা করতে হবেঃ

- টিউবওয়েল বসানোর পূর্বে ভূ-গর্ভস্থ পানির আর্সেনিক মাত্রা পরীক্ষা করতে হবে।
- পুরাতন টিউবওয়েলের পানির আর্সেনিক পরীক্ষা করতে হবে।
- কূপের পানি পান করা যেতে পারে।
- নদী বা পুকুরের পানি ফুটিয়ে পান করা যেতে পারে।
- আক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রচুর ভিটামিনযুক্ত খাদ্য ও শাক-সবজি খেতে হবে।

অগ্নিকাণ্ড

প্রতি বছর অগ্নিকাণ্ডের কারণে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে, হারাচ্ছে অমূল্য সব জীবন। আগুন লাগার মূল কারণ অসাবধানতা। অসাবধানতার সাথে যোগ হয় অজ্ঞতা।

আগুন লাগার কারণ ও উৎসসমূহ ঃ

* জ্বলন্ত চুলা * জ্বলন্ত সিগারেট * জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি * খোলা বাতি * বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট * হট ডাষ্ট ও হট ম্যাটেরিয়াল * ছেলে মেয়েদের আগুন নিয়ে খেলা বা রাসায়নিক বিক্রিয়া * আগুনের স্ফুলিঙ্গ * স্বয়ংক্রিয় অগ্নি প্রজ্বলন * ইঞ্জিনের মিস ফায়ার * ডাষ্ট এক্সোপ্লোশন * মেশিনের ঘর্ষণ * বজ্রপাত * গ্যাস সিলিন্ডারসহ বিভিন্ন ধরণের বিস্ফোরণ * সূর্যরশ্মির প্রতিফলন * পাগলের আগুন লাগানোর অভ্যাস * নাশকতা * অরাজকতা * মশার কয়েল * অতিরিক্ত তাপ * আতশবাজী / বাজি পোড়ানো * পটকা ব্যবহার * আর্সন * উত্তপ্ত ছাই * কেরোসিনের স্টোভ * রান্না ঘরের আবর্জনা * অনিরাপদ বৈদ্যুতিক সংযোগ * অসাবধানতা।

আগুন যাতে না লাগে এবং লেগে গেলে সাথে সাথে যা করণীয় ঃ

মনে রাখতে হবে অগ্নি প্রতিরোধ অগ্নি নির্বাপনের চেয়ে উত্তম। তাই বসতবাড়ি, সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, মিল-ফ্যাক্টরিসহ সর্বত্র অগ্নি প্রতিরোধের ব্যবস্থা থাকা উচিত। এজন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- রান্নার পর চুলা নিভিয়ে ফেলা
- খোলা বাতির ব্যবহার পরিহার করা।
- ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি আসার পূর্ব পর্যন্ত আগুন নেভানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখা।
- বৈদ্যুতিক ফিটিংস মাসে অন্তত একবার পরীক্ষা করে প্রয়োজন হলে পুরানো ফিটিংস পরিবর্তন করতে হবে।
- সব যন্ত্রপাতি আর্থিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- রাসায়নিক পদার্থ এবং জ্বালানি পদার্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ লোক নিয়োজিত রাখতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানে ধুমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বা আলাদা ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানে প্রচুর পানি মজুত রাখতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানে যথোপযুক্ত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র মজুত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক রাখতে হবে।
- অফিস, মিল, ফ্যাক্টরি, শিল্প-কারখানায় প্রতিমাসে একবার অগ্নি নির্বাপন মহড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- আগুন লাগলে সাথে সাথে বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ বন্ধ করতে হবে এবং সাথে সাথে ১৯৯ বা ৯৫৫৫৫৫৫ নম্বরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কন্ট্রোল রুমে খবর দিতে হবে।
- ফায়ার সার্ভিস-এর টেলিফোন নম্বর চোখের সামনে দেয়ালে লিখে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

- পরনের কাপড়ে আগুন লাগলে কখনো দৌড়াবেন না, মাটিতে গড়াগড়ি দিন।
- আগুন লাগলে ঘাবড়ে না গিয়ে মাথা ঠান্ডা রেখে করণীয় ঠিক করুন।
- প্রতিষ্ঠানের সকল স্থান আবর্জনামুক্ত রাখতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানে কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- অপ্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট / কাগজপত্র একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে পুড়িয়ে ফেলা।
- চুলার উপর ভেজা লাকড়ি বা কাপড় শুকাতে দেবেন না।
- ইস্ত্রিতে বৈদ্যুতিক সংযোগ রেখে কখনো যাবেন না।
- হাতের কাছে সব সময় এক বালতি পানি ও এক বালতি বালু রাখুন।

লোক অপসারণ পদ্ধতিঃ

- ইমারজেন্সির সময় লিফট ব্যবহার করা যাবে না।
- ছাদে না উঠে সকলকে নিচের দিকে নামতে হবে।
- নামার সময় ইমারজেন্সি এক্সিট ব্যবহার করতে হবে।
- উপর থেকে নিচে লাফ দেয়া যাবে না।
- জরুরি অবস্থায় নিরাপত্তা কর্মীদের টর্চ ব্যবহার করতে হবে।
- আগুন যেহেতু উর্ধ্বমুখী তাই প্রথমে যে ফ্লোরে আগুন সে ফ্লোর এবং পর্যায় ক্রমে উপরের ও সবশেষে নিচের ফ্লোরের লোক নামাতে হবে।

লোক অপসারণে অগ্রাধিকারঃ

- প্রতিবন্ধী, শিশু ও সন্তানসম্ভবা মা;
- বৃদ্ধ লোক;
- মহিলা;
- অফিস স্টাফ।

আগুনে পুড়ে গেলে করণীয় ঃ

- আক্রান্ত ব্যক্তিকে এমনভাবে শুইয়ে দিতে হবে যাতে তার পুড়ে যাওয়া অংশ খোলা দিকে থাকে। তারপর জগ বা মগে ঠান্ডা পানি বা বরফ পানি এনে পোড়া জায়গায় ঢালতে হবে যতক্ষণ না তার জ্বালা-যন্ত্রণা কমে এবং ক্ষতস্থানের গরমভাবও কমে না যায়।
- আক্রান্ত স্থানটি ফুলে যাবার আগে সেখান থেকে ঘড়ি, বেল্ট, আংটি (যদি থাকে), কাপড় খুলে ফেলতে হবে।
- পুড়ে যাওয়া অংশের কাপড় যদি লেগে থাকে তবে সেটা না টেনে বাকি কাপড় কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- পরিস্কার জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ বা কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থান হালকা করে বেঁধে দিতে হবে।
- যদি মুখে কোথাও পুড়ে যায় তবে পানি দিয়ে ঠান্ডা করতে হবে যতক্ষন না ক্ষতস্থান ঠান্ডা হয় এবং ব্যাথা কমে। মুখ ঢাকবার কোন প্রয়োজন নেই, তবে পরিস্কার জীবাণুমুক্ত কাপড় দিয়ে এমনভাবে মাস্ক তৈরি করতে হবে যাতে নাক, মুখ ও চোখ বের করে মুখ ঢাকা যায়।
- পোড়া জায়গা দিয়ে শরীরের প্রয়োজনীয় জলীয় পদার্থ বের হয়ে যায়, যার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি শকে (Shock) চলে যেতে পারে। অর্থাৎ তার রক্তচাপ কমে যায়, হৃৎপিন্ডের স্পন্দন কমে যায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যহত হয়। এই অবস্থায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। চিকিৎসকের পরামর্শে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ব্যাথার, জ্বরের ঔষধ ও জীবাণুনাশক এ্যন্টিবায়োটিক দেয়া যেতে পারে। এমনকি ক্ষতস্থান যদি অপরিস্কার মনে হয় তবে টিটানলও দিতে হতে পারে।
- ডারমাজিন মলম নিকটে থাকলে সাথে সাথে তা পোড়াস্থানে পুরু করে লাগিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

- যদি আক্রান্ত ব্যক্তি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে আর সহজে জ্ঞান না ফেরে তবে অবশ্যই তাকে নিকটতম হাসপাতালে বা চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। তবে হাসপাতালে নেয়ার সময়টুকু ভিতর তার শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দনের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, ফোস্কা পড়লে তার উপরের চামড়া তুলে ফেলা যাবে না। ঐ স্থান খোলা রাখতে হবে। এতে করে ক্ষতস্থান তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। পুড়ে যাওয়া অংশ নাড়াচাড়া না করাই ভাল।

প্রত্যেকেই আগুনের ভয়াবহতা এবং অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সচেষ্ট হতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে অগ্নি নির্বাপনের চেয়ে অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ উত্তম।

সাপে কাটা

সর্পে দংশন বা সাপে কাটা বাংলাদেশের একটি নিয়মিত ঘটনা। বিশেষ করে বন্যার সময়ে সাপে কাটা রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায়। বন্যার সময় দেখা যায় মানুষ, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, জন্তু, জানোয়ার উচু জায়গায় একত্রে বসবাস করে। তখন সাপের কাটার পরিমাণও বেড়ে যায়। অনেক বন্যার সময় পানিতে ডুবে মৃত্যুর চেয়ে সর্প দংশনে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি দেখা যায়।

সাপের কামড় থেকে রক্ষা পাবার উপায়ঃ

- সাপ ভয় না পেলে বা আক্রান্ত না হলে কাউকে কামড় দেয় না। তাই সবাইকে বুঝাতে হবে সাপ দেখে যেন কেউ মারতে না যায়, বা তাকে চলার পথে বাধার সৃষ্টি না করা হয়।
- বন্যার সময় শোবার ঘরে খাটের নিচে কার্বলিক এসিড রেখে দিলে সাপ ঘরে প্রবেশ করবে না।
- বন্যার সময় সাপ হাড়ি, পাতিল, ঘরের মাচায় আশ্রয় নেয়। তাই এসব ব্যবহারের সময় খেয়াল রাখতে হবে এগুলির ভিতর সাপ আছে কিনা।

সাপে কামড় দিলে যা করণীয়ঃ

- সাপে কাটা রোগীকে কিছু খাওয়ানো যাবে না।
- সাপে কামড় দিলে প্রথমেই খেয়াল করতে হবে এটা বিষধর সাপ কিনা। বিষধর সাপ দুটো দাঁতই সমান ভাবে বসাবে। মনে রাখতে হবে শতকরা ৭৫ ভাগ সাপেরই বিষ নেই।
- অত্যন্ত দ্রুততার সাথে রাবার, দড়ি, কাপড়ের পাড় বা ফিতা দিয়ে শক্ত করে হাটুর নিচে কামড়ালে হাটুর উপরে, আঙ্গুলে কামড়ালে আঙ্গুলের গোড়ায় বা কনুইয়ের গোড়ায় এমন ভাবে বাধঁতে হবে যাতে রক্ত চলাচল বন্ধ থাকে। কারণ রক্ত চলাচলের ফলে সারা শরীরে বিষ মিশে যায়।
- বিষদাঁতে কাটা স্থানে স্টেরাইল ধারালো ব্লেড বা ছুরি দিয়ে কেটে বিষ বের করে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন শিরা বা ধমনী কেটে না যায়।
- ক্ষতস্থানে ঠান্ডা কিছু লাগাবেন না।
- রোগীকে জাগিয়ে রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে রোগী যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে।
- গরম পানি দিয়ে কাটাস্থান ধুয়ে ফেলতে হবে।
- কোন ওঝা বা মন্ত্র বলে বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ তারা সাপের বিষ নামাতে পারে না।
- সাপে কাটা রোগীকে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে যেমন- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল ও সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিতে হবে।

হেপাটাইটিস বা জন্ডিস

বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসের পর অনেকে হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত হন। জনগণের কাছে যা সাধারণভাবে জন্ডিস নামে পরিচিত।

কি কারণে জন্ডিস হয়ঃ

- সাধারণত পানিতে মলমূত্র ত্যাগ করলে, মলমূত্র থেকে পানি দূষণের ফলে দূষিত পানি পান করলে বা ব্যবহার করলে।
- জন্ডিস একটি ছোঁয়াচে রোগ। জন্ডিসে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে গেলেও জন্ডিস হতে পারে।

জন্ডিস হলে কি করণীয়ঃ

- পানি ফুটিয়ে বা বিশুদ্ধকরণ বড়ি দ্বারা পানি বিশুদ্ধ করে পান করা।
- আক্রান্ত হলে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকা।
- জন্ডিসে আখ (ডায়াবেটিকস না থাকলে), ডাবের পানি (গ্যাষ্ট্রিক না থাকলে), জাওভাত, ছোটমাছ, পেঁপে ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে।
- বেশি বমি হলে ডাবের পানি ও স্যালাইন খাওয়া যেতে পারে।
- যথাসম্ভব শীঘ্র চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া।

জন্ডিস প্রতিরোধের উপায়ঃ

- আক্রান্ত ব্যক্তির প্লেট, গ্লাস ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিস আলাদা রাখা।
- সকল সময় বিশুদ্ধ পানি দ্বারা থালা-বাসন ও হাঁড়ি-পাতিল পরিষ্কার রাখা।

রক্তক্ষরণ

দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন কারণে আঘাত প্রাপ্ত হতে পারে, কেটে যেতে পারে যার ফলে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

রক্তক্ষরণ হলে যা করতে হবে-

- রোগীকে সহজ এবং স্থিরভাবে শোয়াতে হবে। মনে রাখতে হবে নড়াচড়া বেশি হলে রক্তপাত বেশি হয়।
- সময় নষ্ট না করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চাপ দিয়ে রাখতে হবে।
- কোন জমাট রক্ত সরানো যাবেনা, সরালে রক্তপাত বেশি হতে পারে।
- ক্ষতস্থানে কিছু ঢুকে থাকলে তা সাবধানে সরাতে হবে। তবে শক্তভাবে কিছু ঢুকে থাকলে চিকিৎসকের কাছে পাঠাতে হবে।
- ক্ষতস্থান স্যাভলন, ডেটল বা অন্য কোন এন্টিসেপটিক মেশানো পানিতে পরিস্কার করতে হবে। পরিস্কার করা শুরু করতে হবে ক্ষতের কেন্দ্র থেকে।
- ক্ষতস্থানে স্টেরাইল গজ দিয়ে ব্যান্ডেজ লাগাতে হবে।
- বেশি রক্তপাত হলে রোগীকে পানি খেতে দিতে হবে। চিকিৎসকের কাছে নিয়ে শিরার মধ্যে স্যালাইন দিতে হবে। এরপর শরীরে রক্ত দেয়া দরকার হতে পারে।
- সবসময় ডাক্তারের পরামর্শ মত চলতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারণা

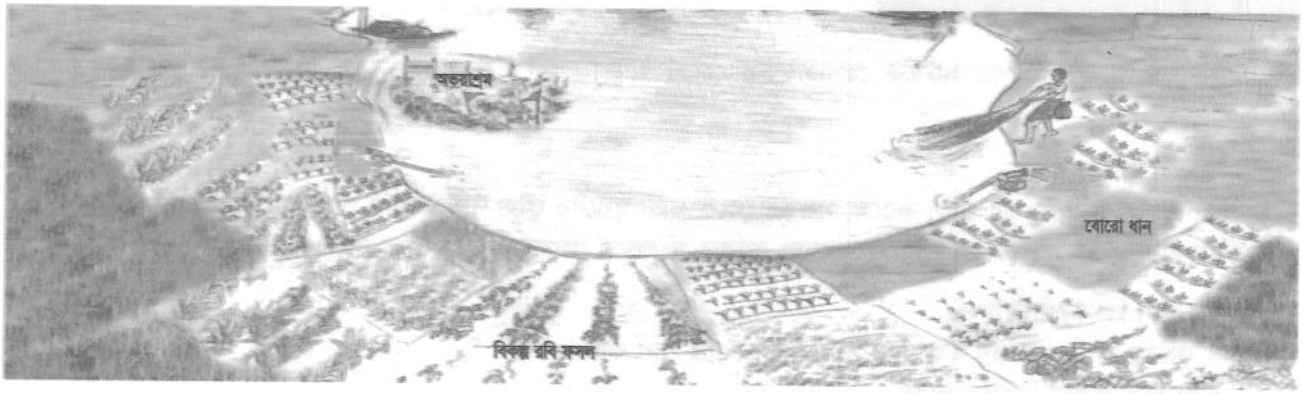

পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে এবং পৃথিবীর সকল স্থানে ভৌত, প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবন ব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ব-দ্বীপ হলো বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ হলো পৃথিবীর উষ্ণায়ন যা ১৮৫০ সাল থেকে শুরু হয়েছে। গত ৫০ বছরে এ উষ্ণায়নের হার অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি এবং এর প্রধান কারণ হচ্ছে উন্নত বিশ্বে ব্যাপকভাবে জীবাশ্ম জ্বালানী, গ্রীণহাউস গ্যাস প্রভৃতির ব্যবহার। পৃথিবী সূর্য থেকে যে তাপ পায় তা আবার প্রতিফলন ও বিকিরণের মাধ্যমে মহাশূন্যে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু গ্রীণ হাউস গ্যাসের পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় সেগুলো তাপ আটকে পৃথিবীর এ তাপ ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতাকে হ্রাস করছে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অধিকহারে বর্তমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে এ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। সাধারণ ধারণা হলো- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক আপদসমূহ যেমন; অধিকতর বন্যা, অসময়ে বন্যা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং শুকনো ঋতুতে কম বৃষ্টিপাত, খরা, তাপদাহ, শৈত্য প্রবাহ, নদী-নালা ভরাট, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, অধিকতর সংখ্যায় এবং তীব্রতায় ঘূর্ণিঝড় এবং অধিকতর ঘন ঘন মাত্রায় জলোচ্ছ্বাসের সংখ্যা ও হার বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যদ্বানী করতে কয়েকটি জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ মডেল বাংলাদেশে পরীক্ষা করা হচ্ছে। প্রধান মডেলগুলো হচ্ছে PRECIC, CFAB, GCM ইত্যাদি। তাছাড়া জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে গ্রহণের জন্য একগুচ্ছ সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব চিহ্নিত করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে আমাদের যা করণীয়ঃ

- উপকূলীয় কৃষি শস্য এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ কৃষিশস্য অভিযোজন করা;
- উপকূলীয় এবং দীর্ঘায়িত বন্যা এলাকায় মাছের চাষ করা;
- পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থাসমূহের সামর্থ্য সৃষ্টি করা;
- উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা;
- উপকূলীয় বনায়ন করা;
- আপদে আক্রান্ত এলাকার জন্য বীমার ব্যবস্থা করা এবং
- খরা, বন্যা ও লবণাক্ততার মাঝে ফলনশীল শস্যের ওপর গবেষণা করা।

তবে মনে রাখতে হবে জলবায়ু পরিবর্তন কোন এক দেশের পক্ষে এককভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এটি সমগ্র বিশ্বব্যাপী একটি সমস্যা, তাই সকল রাষ্ট্রকে তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে একমত হয়ে কাজ করতে হবে। বিশ্বের উন্নতদেশগুলো ২০৫০ সালের মধ্যে গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন অর্ধেক কমিয়ে আনার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। বাংলাদেশকে এবং দেশের জনগণকে এখনই এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবিলায় আমরা নতুন কৌশল ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারি।

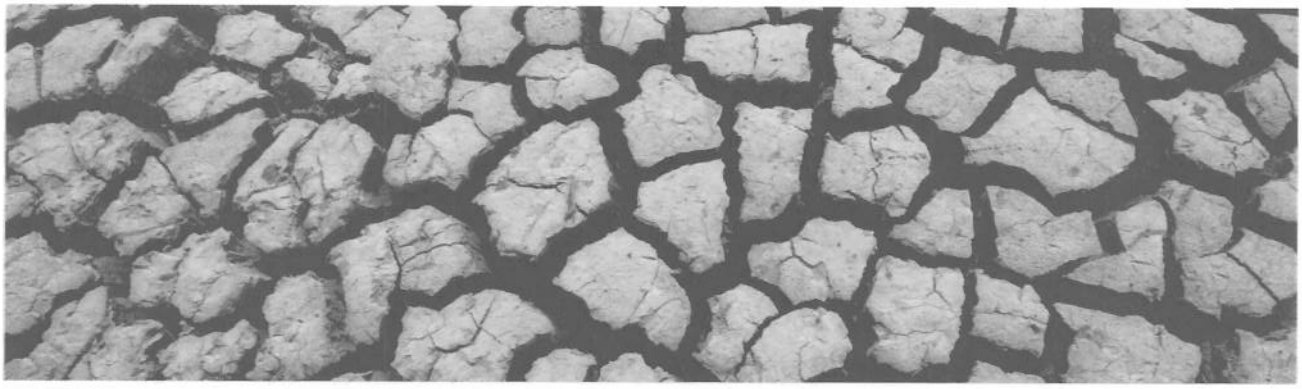

খরা

খরা এমন একটি আপদ যা মোকাবেলা করা কঠিন। এটা ধীরে ধীরে প্রায় বিনা নোটিশে এসে হাজির হয়। আবার কখনো কখনো নাটকীয়ভাবে এসে হাজির হয় এবং তার ক্ষয়ক্ষতির পরিমান বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মত ভয়ঙ্কর হতে পারে।

গাছ বৃদ্ধির জন্য যেখানে মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ রস থাকে না, সে অবস্থাকে খরা বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যখন মাটির রস অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায় সেই অবস্থাকে খরা বলে। যা অনাবৃষ্টি কিংবা সেচের অভাবেও হতে পারে।

অনাবৃষ্টি, বৃক্ষনিধন, ভূগর্ভস্থ পানির যথেচ্ছ উত্তোলন, নদীর প্রবাহে বাধা দান, পানি সংরক্ষণের অভাব, নদীর গতিপথ বা ভৌগোলিক পরিবর্তন, ওজোন স্তরের ক্ষয় ইত্যাদি কারণে খরা হয়ে থাকে।

খরার সময়ঃ

বছরের অন্যান্য সময়ের চাইতে চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম আবহাওয়ায় মাটি ও ফসল বেশি খরা পীড়িত হয়। কারণ শুষ্ক মৌসুমের শেষে মাটি তেমন আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে না। বিশেষ করে সেখানে যদি সেচ বিহীন রবি ফসল লাগানো হয় তাহলে আর্দ্রতা মোটেই থাকে না। তাছাড়া গ্রীষ্মকালে ফসলের জলীয়বাষ্পাকারে পানি পরিহারের হার খুব বেশি। চৈত্র-বৈশাখ মাসে পানি বাষ্প হওয়ার হার মাসে ৫-৭ ইঞ্চি। যেটা বর্ষা মৌসুমে মাসে ৪ ইঞ্চি। অগ্রহায়ন, পৌষ ও মাঘ মাসে এর হার হল ২ থেকে ৩ ইঞ্চি।

বর্ষা মৌসুমে এবং শীতের মাসগুলোতে খরায় ফসলের সবচাইতে কম ক্ষতি হয়। স্বাভাবিকভাবে এই সময়ে খরা শুরু হলেও মাটিতে প্রচুর আর্দ্রতা থাকে। তাছাড়া এই মৌসুমে ফসল কম আর্দ্রতা টেনে নেয়। এই মৌসুমে গাছ কর্তৃক পানি বাষ্প হওয়ার হারও কম।

খরার লক্ষণঃ

খরার ফসলের সময় দেশের পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোয় ১৫ চৈত্র থেকে ৩০ কার্তিক পর্যন্ত, মধ্য অঞ্চলীয় জেলাগুলোতে ১ বৈশাখ থেকে ৩০ কার্তিক পর্যন্ত, পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে ১৫ বৈশাখ থেকে ৩০ কার্তিক পর্যন্ত দুই সপ্তাহ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যদি শূন্য অথবা ১ ইঞ্চির কম হয় জেলা, উপজেলা, ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উচিত খরার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

তাছাড়া জমির উপরিভাগ শুষ্ক দেখলেই সে জমিতে রসের অভাব কিংবা তাতে সেচের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বলে মনে করলে চলবে না। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মচারী ও কৃষকদের উচিত জমি খুঁড়ে ২-৩ ইঞ্চি নিচের মাটি আর্দ্র না শুষ্ক তা দেখা এবং ফসলে সেচের প্রয়োজন আছে কিনা তা নির্ধারণ করা। এটা না দেখে জমি শুষ্ক এ ধারণা করা উচিত নয়।

খরা সতর্কতাঃ

জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে যথাক্রমে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, থানা কৃষি কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় খরা দেখা দিলে কৃষকদেরকে সচেতন করে করণীয় নির্ধারণ করে দিতে হবে।

তাছাড়া খরা সহিষ্ণু জমিতে দুর্ভিক্ষে রক্ষিত ফসল, জমিতে গভীর চাষাবাদ, জৈব সার প্রয়োগ, জমির আর্দ্রতা সংরক্ষণ, শিশির ব্যবহার, সেচের প্রতিবন্ধকতা রোধ, আপদকালীন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে খরা বিষয়ে কৃষকদেরকে সচেতন করে খরা বিষয়ে সতর্কতামূলক পন্থা অবলম্বনে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

খরা প্রতিরোধঃ

খরা প্রতিরোধে নিম্নরূপ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যায়ঃ

- একমাত্র সেচের মাধ্যমে খরা প্রতিরোধ করা যায়। খরাগ্রস্থ জমিতে কি ধরনের সেচের ব্যবস্থা করলে সুবিধা হবে সে ব্যাপারে কৃষকদের বুঝতে হবে, যেমন- দোলনা, দোন, পাতকুয়া, হস্তচালিত পাম্প, লোলিফট পাম্প, অগভীর নলকূপ, গভীর নলকূপ অথবা খাল ইত্যাদি।
- মাটির নিচে কিংবা মাটির উপরিভাগে যদি পানি না পাওয়া যায় তাহলে ঐ অঞ্চলে কোন ধরনের সেচ প্রয়োজন তার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। যেমন- পুকুর খনন, বাঁধ তৈরি অথবা নিকটস্থ মিষ্টি পানির নদী থেকে খাল খনন করে জমি পর্যন্ত নিয়ে আসা।
- যদি কৃষকরা সময় মত সেচের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে খরার ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যেতে পারে। যখনই মাটি ও চারা গাছে পানির প্রয়োজন কৃষকদের তখনই সেচের ব্যবস্থা করা উচিত। এর অর্থ হল এই যে, সেচের ব্যবস্থা সব সময় আগে থেকেই প্রস্তুত রাখতে হবে যাতে পাম্প, নলকূপ, কূপ খনন, হস্তচালিত পাম্প, দোন অথবা দোলনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে এতটুকু দেরী না হয়।
- খরা মোকাবিলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
- চাষাবাদের ফসলের ভিন্নতা খরা মোকাবিলার একটি কৌশল হতে পারে।
- মাটিতে জৈব সারের ব্যবহারে মাটির পানিধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- প্রচুর বৃক্ষরোপন করলে বাতাসের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে যায়।
- পানি সংরক্ষণের জন্য জলাধার তৈরি ও তা সুরক্ষিত করা যেতে পারে।
- খরা সহনশীল জাতের ফসল উদ্ভাবন করা।
- বিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র/ছাত্রীদের বৃক্ষরোপনে উৎসাহিত করা, ইত্যাদি।
- খরাপ্রবণ এলাকায় আগে থেকেই সেচের সকল প্রস্তুতি ও প্রযুক্তি সংগ্রহে রাখা যেতে পারে, যাতে করে শস্যের পানির চাহিদা যথাসময়ে পূরণ করা যায়।
- খরাপ্রবণ এলাকায় জমিতে গভীরভাবে লাঙল দেয়া প্রয়োজন, যাতে নিচের ভূমিস্থ পানি উপরের মাটির (Top soil) সাথে মিশে আর্দ্রতা বাড়াতে পারে।
- মাটিতে ফসফেট জাতীয় সার ভাল শেকড় তৈরির জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। যাতে করে শেকড় মাটির গভীরে গিয়ে পানি শোষণ করতে পারে।

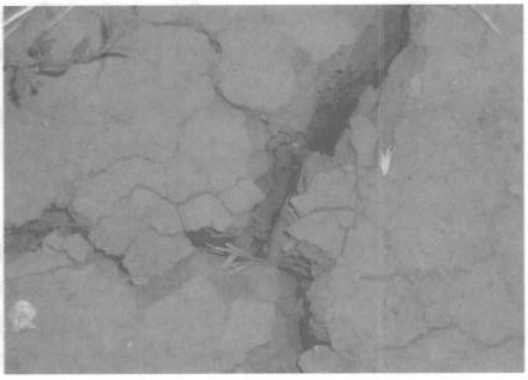

কেবলমাত্র সময়মত সেচ ও চাষাবাদ পদ্ধতির পরিবর্তনের মাধ্যমেই খরা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। খরাপ্রবণ এলাকার ভিন্নতার উপর ও কৃষকের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের আলোকে সঠিক সেচ পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত।

বজ্রপাত

বাংলাদেশে আঘাতজনিত হতাহতের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো বজ্রপাতজনিত বিদ্যুৎস্পৃষ্টতা। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ বর্ষাকালে বজ্রপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ২০০৭ সালে বজ্রপাতে হতাহতের সংখ্যা মোট ১৯১ জন, এর মধ্যে মারা যায় ১০৮ জন এবং বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতায় ভোগে ৮৩ জন।

বজ্রপাতজনিত বিদ্যুৎস্পৃষ্টতার কারণঃ

বজ্রপাত আসলে এক ধরনের বিদ্যুৎপ্রবাহ। যেসব বস্তু বা পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাকে বিদ্যুৎ সুপরিবাহী পদার্থ বলে। যেমন- পানি, বিভিন্ন প্রাণী, ভেজা জিনিস, বিভিন্ন ধাতব পদার্থ ইত্যাদি। বজ্রপাতের সময় অত্যধিক হাই ভোল্টেজের বিদ্যুৎ তৈরি হয় এবং সে তার কাছাকাছি যে পরিবাহী পদার্থ পায় তার মধ্য দিয়েই প্রথমে প্রবাহিত হয়। এ জন্য কোন খোলা মাঠ বা বিরাট জলাশয়ে গাছপালা না থাকলে মানুষ বা প্রাণী যারা বজ্রপাত সৃষ্টির কাছাকাছি থাকে তারাই বজ্রপাতজনিত বিদ্যুৎস্পৃষ্টতায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়।

প্রতিরোধে করণীয়ঃ

- গ্রীষ্মকালীন বিশেষ করে চৈত্রের শেষে কালবৈশাখী ঝড় হয়। এ সময়ে এবং বর্ষা মৌসুমে বজ্রপাতের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। তাই এ সময়ে যারা মাঠে ময়দানে কাজ করেন বিশেষ করে চাষী, জেলে সম্প্রদায় এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষেরা যেন বিশেষ করে বিকেল বেলায় ঐ সময় খোলা স্থান পরিহার করতে চেষ্টা করেন।
- বজ্রপাতের সময় কাছাকাছি অপেক্ষাকৃত শক্ত কোনো ঘরে আশ্রয় নিতে হবে।
- বজ্রপাতজনিত বিদ্যুৎ কাছাকাছি পরিবাহী পদার্থকে প্রথমে আকর্ষণ করে তাই এ সময়ে খোলা মাঠে থাকলে মাথা নিচু করে গুটিসুটি হয়ে বসে পড়তে হবে।
- বড় ধরনের জলাশয় থেকে দূরে থাকতে হবে। এমন অনেকে আছে যারা এ সময় মাছ ধরার জন্য বড় বিল, পুকুর বা নদী-খালে যায়, কারণ সে সময়ে এ সকল স্থানে মাছের উৎপাদন বা সমাগম বৃদ্ধি পায়। মনে রাখা ভালো জীবনের মূল্য অনেক বেশি।
- বজ্রপাতের সময় রাস্তায় চলাচল করলে হাতে কোনো লোহার হাতলের ছাতা থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। এ সময়ে সাইকেলের উপর থাকলে তা থেকে নেমে পড়তে হবে।
- শিশুদের এ সময়ে বাইরে যেতে বারণ করতে হবে।
- কোন গাছের নিচে আশ্রয় নেয়া যাবে না। কারণ গাছ যদি বজ্রপাতে আক্রান্ত হয় তাহলে গাছের নিচে আশ্রয়গ্রহণকারীও আক্রান্ত হতে পারে। এ সময় কোন মজবুত সম্ভব হলে পাকা গৃহে আশ্রয় নিতে হবে।
- কোন ধাতব বস্তু যেমন পাইপ, বিদ্যুতের খুঁটি অথবা ধাতব বস্তুর বেড়া কিংবা যোগাযোগের জন্য টাওয়ারের কাছে দাঁড়াবেন না।
- বজ্রপাতের সময় ঘরে বা বাইরে টেলিফোনের প্লাগ বা কম্পিউটারের মডেম ব্যবহার করা যাবে না।
- ঘর-বাড়িকে বজ্রপাত থেকে মুক্ত রাখার জন্য ছাদের কোনায় বাড়ির ছাদ থেকে ৪/৫ ফুট উচ্চতায় বিদ্যুৎ পরিবাহী গ্যালভানাইজিং লোহার রড/ শিক মাটির সাথে স্থাপন করতে হবে। যাতে বিদ্যুৎ সরাসরি মাটিতে চলে যেতে পারে।
- বজ্রপাতের সময় গাড়িতে থাকলে গাড়ির জানালা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে। গাড়ির দরজা বা জানালা স্পর্শ করা যাবে না।
- বজ্রপাতের সময় দু'হাত দিয়ে কান চেপে রাখতে হবে যাতে শব্দের কারণে কানের শ্রবণশক্তি নষ্ট না হয়।
- বিদ্যুৎ চমকানোর সময় চোখ বন্ধ করে রাখতে হবে যাতে চোখ অন্ধ হয়ে না যায়।
- বজ্রপাত বন্ধ হবার পরও আধা ঘন্টা পর্যন্ত বাইরে বের হওয়া যাবে না।

ভূমিধস

ভূমিধস বাংলাদেশের অন্যতম একটি দুর্যোগ। মূলত মানব সৃষ্ট সমস্যার কারণেই ভূমিধস হচ্ছে। বাংলাদেশের পাহাড়গুলোর প্রকৃতিগত ভুমিধসের সমস্যা কম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রতিনিয়ত পাহাড়ের তলদেশ ও চুড়া কাটা হচ্ছে, ফলে ভারসাম্য বিনষ্ট এবং উপরে পুকুরের মতো গর্তের কারণে পাহাড় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে এবং ভূমিধস এর মত দুর্যোগ সংঘটিত হচ্ছে। এছাড়া অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ায় ভূমিধসের মতো দুর্যোগ সংঘটিত হচ্ছে।

প্রতিরোধে করণীয় ঃ

- পাহাড়ি এলাকায় বসবাসরত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ।
- বেসরকারি সংগঠন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় থেকে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে অন্যত্র স্থানান্তর বিষয়ে বেসরকারি মালিকানার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট জবাবদিহিতা গড়ে তোলা।
- পাহাড় ধসের আগাম সংকেত প্রদান এবং আগাম কার্যক্রমে আন্তবিভাগীয় সমন্বয় জোরদার করা।
- পাহাড়ি এলাকায় মানব বসতি এবং অন্যান্য আর্থ সামাজিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।
- পাহাড়ি এলাকার Land use plan তৈরি করা, যার মাধ্যমে যেখানে যে ধরনের কাঠামো প্রয়োজন হবে সেরুপ কাঠামো রূপায়ন করা।
- পাহাড়ি এলাকায় পরিকল্পিত নিবিড় বনায়ন।

আকস্মিক বন্যা/পাহাড়ি ঢল (Flash flood)

বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল প্রায়ই আকস্মিক বন্যায় আক্রান্ত হয়। মূলত উচ্চভূমি পাহাড় -পর্বত থেকে হঠাৎ করে পানি প্রবাহের ফলে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়। সাধারণত এপ্রিল থেকে অগাষ্ট মাস সময়ে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। যেহেতু হঠাৎ করে প্রবল পানি প্রবাহের ফলে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয় সেহেতু তা দু'তিন ঘন্টার ভিতরে মারাত্মক ধ্বংসাত্মক রূপ নিতে পারে। যদিও এটা দীর্ঘস্থায়ী নয়, তবুও তা স্বল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে।

প্রতিরোধে করণীয় ঃ

- বর্তমানে আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস দেয়া হচ্ছে, এর পূর্বাভাস অনুযায়ী বন্যার মতই সতর্ক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- যে সব এলাকায় প্রায়শই আকস্মিক বন্যা বা পাহাড়ি ঢল দেখা দেয় সেখানে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে উৎপাদনক্ষম আগাম ফসল চাষাবাদ করতে হবে। সাধারণত এপ্রিল- আগষ্ট মাসের মধ্যেই এ বন্যা দেখা দেয়, তাই এ সময়ের মধ্যে পড়ে না এমন ফসল চাষাবাদ করতে হবে।

- আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকায় অপেক্ষাকৃত কম সময়ে ফলনশীল প্রকৃতির ধান বা অন্যান্য ফসলের বীজ সংরক্ষণে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- পার্শ্ববর্তী কোন উঁচু এলাকায় ব্যাপক বৃষ্টিপাত হলে নিম্নাঞ্চলে তার প্রভাব পড়ে। তাই পার্শ্ববর্তী কোন উচুঁ এলাকায় ব্যাপক বৃষ্টিপাত হলে নিম্নাঞ্চলে আগাম সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- কোন এলাকায় আকস্মিক বন্যা দেখা দিলে সেচ সুবিধার জন্য নদীর সঙ্গে সংযুক্ত খালসমূহের সংযোগস্থল বা উৎসমুখ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে হবে।
- আকস্মিক বন্যার ক্ষয়ক্ষতি লক্ষ্য করে বাঁধ নির্মাণ করতে হবে।
- আকস্মিক বন্যার প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে বন্যাকবলিত গ্রামসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে বাঁশ, চাটাই (চাল্লি) বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক উপকরণ দিয়ে গ্রাম এলাকার ভাঙন রোধে সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্লুইস গেটের দায়িত্বে থাকা গ্রামবাসীদের যথাসময়ে আকস্মিক বন্যা মোকাবিলায় প্রয়োজন অনুযায়ী খোলা বা বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

জলাবদ্ধতা (Water logging)

কেবল প্রাকৃতিক কারণেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়না। মূলত অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম, রাস্তাঘাট ও বাঁধ নির্মাণ, খনন কার্যক্রম ও পানির অব্যবস্থাপনার কারণেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। বৃষ্টি ও বন্যার পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতাই জলাবদ্ধতার কারণ। অনেক জায়গায় স্থির পানি বেরিয়ে যাবার পথ পায় না, ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। অনেক জায়গায় জলাবদ্ধতা ক্ষেতের উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। আবার অনেক জায়গায় জলাবদ্ধতার কারণে চাষাবাদই করা যায়না। ঢাকা শহরের জলবদ্ধতার মূল কারণ অপরিকল্পিত বসতি স্থাপন ও পানি প্রবাহের জন্য ড্রেন, খাল, পুকুরগুলো অবৈধ দখলদারির কবলে চলে যাওয়া। এছাড়া যত্রতত্র নির্মাণ কাজ ও নির্মাণ সামগ্রী ফেলে রাখা হয়। ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেই ঢাকা শহরের রাস্তা-ঘাট, বসতবাড়ি তলিয়ে যায় এবং জনগণকে অবর্ণণীয় কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়।

জলাবদ্ধতা প্রতিরোধে করণীয় ঃ

- সরকারের পরিবেশ বান্ধব পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।
- বাঁধ তৈরির সময় এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে জোয়ার-ভাটার সময় পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্থ না হয়।
- শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- জলাবদ্ধ এলাকায় এমন ফসল চাষাবাদ করতে হবে যা জলাবদ্ধতার মধ্যেও বেড়ে উঠতে পারে।
- জলাবদ্ধ এলাকার জনগণকে মৎস্য চাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের পথ অবলম্বন করতে হবে।
- জলাবদ্ধ এলাকায় ভাসমান মাচা তৈরি করে সেখানে বিভিন্ন রকমের সবজি ও অন্যান্য ফসল চাষাবাদ করা যেতে পারে।
- জলাবদ্ধ এলাকার সেনিটেশন ব্যবস্থা এমন পরিকল্পনা মাফিক গ্রহণ করতে হবে যেন জলাবদ্ধতার সময় পরিবেশ নষ্ট না হয়।
- বাঁধ নির্মাণের সময় মাটির চরিত্র বিবেচনায় এনে বাঁধ নির্মাণ করতে হবে।
- জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য স্বাভাবিক নিষ্কাসনের পক্ষে নদীনালা সংস্কার, খাল-খনন ও সংযোজনসহ এরূপ অন্যান্য সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- উপকূলীয় বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও প্রয়োজন অনুযায়ী উচ্চতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- জলাবদ্ধ এলাকায় সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য বসবাস স্থলের চারপাশে কার্বোলিক এসিড ছড়িয়ে দিতে হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের দায়িত্ব

মাঠ পর্যায়ে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বাবলি

স্বাভাবিক সময়ে ঃ

- ঝুঁকি পরিবেশ নির্ণয় এবং ঝুঁকি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা;
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া;
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী তহবিল গঠন করার উদ্যোগ নেয়া;
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করা;
- গৃহস্থালি বা সমাজ পর্যায়ের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সফল ঘটনাগুলোর ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া;
- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করে নিয়মিত দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা;
- দুর্যোগ সংক্রান্ত পূর্বাভাস গ্রহণ এবং এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সিস্টেম গড়ে তোলা;
- পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণ কাজ পরিচালনার বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা;

জরুরি সময়ে ঃ জরুরি সাড়া প্রদান পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা

সতর্ককালীন সময়েঃ

- পূর্বাভাস প্রচার করা, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে অপসারণ করা, উদ্ধারকাজ ও উদ্ধার দলকে প্রস্তুত করার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা;
- পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং পূর্বাভাস প্রচারের সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা;
- জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবামূলক ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য সকলকে সতর্কাবস্থায় প্রস্তুত রাখা;
- আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের কাছের নির্ধারিত স্থান হতে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের প্রয়োজনীয় বিকল্পগুলো নির্ধারণ করে রাখা;
- সমাজভিত্তিক খাবার স্যালাইন তৈরি ও পানি বিশুদ্ধকরণের একটি মহড়া পরিচালনা করা এবং পানি বিশুদ্ধ করে সরবরাহ করার প্রস্তুতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া;
- জীবনরক্ষাকারী ওষুধ ইউনিয়ন পর্যায়ে মজুত রয়েছে কি-না তা খতিয়ে দেখা;
- আপদকালের জরুরি কাজ এবং দায়িত্ব সম্পর্কিত একটি চেকলিস্ট তৈরি করা;

- উদ্ধারকাজ পরিচালনা, ত্রাণকাজ এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় জরুরি উপকরণ ও লজিস্টিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে তার চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা নেয়া।

আপদকালেঃ

- প্রাথমিক উদ্ধারকাজ পরিচালনা এবং অন্যদেরকে উদ্ধার কাজে সহযোগিতা প্রদান করা;
- পানি শোধনের ট্যাবলেট এবং খাবার স্যালাইন প্রস্তুতসহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধের জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ন্যায্যতার ভিত্তিতে জরুরি ত্রাণ বিতরণ কাজের সমন্বয় করা;
- আপদ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজবে জনগণ যাতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে না পড়ে সেজন্য জনসাধারণকে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা;
- দুর্যোগকালে সহায়তা প্রদানে নিয়োজিত স্থানীয় এবং বাইরের সাহায্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের নিরাপত্তা, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা, শিশু খাদ্য সরবরাহ, আশ্রয়কেন্দ্রে সেবা প্রদান এবং সেবা সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মান উন্নয়নে ব্যবস্থা নেয়া;
- আহত ব্যক্তিদের জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং মৃত ব্যক্তিদের দ্রুত দাফন এবং মৃত প্রাণীদেহের দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- জনগণের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদসমূহ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে সহযোগিতা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা;
- দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে পেশ করা।

আপদ-পরবর্তী সময়ে পুনর্গঠন পর্যায়েঃ

- প্রদত্ত নীতিমালার আলোকে ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত উপাত্ত চূড়ান্তভাবে যাচাই করে উপজেলা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা;
- প্রদত্ত নীতিমালার অনুসরণে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত পুনর্বাসন উপকরণাদি সমন্বিত এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- প্রাপ্ত সম্পদ বিতরণের হিসাব উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করা;
- আপদ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্র হতে ফেরা জনগণ যেন তাদের পূর্বস্থানে ফিরে যেতে পারে সে জন্য সার্বিক ব্যবস্থা নেয়া;
- আপদের ফলে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা;
- আহত ব্যক্তিরা যেন যথোপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা পায় সেজন্য স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়া এবং প্রয়োজনে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সহযোগিতার জন্য সুপারিশ করা;

- আপদকালীন ও আপদ-পরবর্তী কাজের অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত শিখনগুলো নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে কর্মশালার আয়োজন করা বা অন্তত আপদ পরবর্তী কমিটির যে কোন সভায় আলোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এর ভিত্তিতে ভবিষ্যত কর্মপন্থা উন্নত করার ব্যবস্থা নেয়া;
- এ ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলি এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক আদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করা;
- স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি গঠন করতে পারবেন।

উপসংহার

বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত। বাংলাদেশে প্রধানত যে সব দুর্যোগ দেখা দেয় তার মধ্যে প্রায় সবগুলোই ঘূর্ণিঝড় ও আবহাওয়ার নতুন সতর্ক সংকেত এবং গণদুর্যোগ বার্তা তুলে ধরা হয়েছে। এ পুস্তিকায় বর্ণিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থা, এনজিও কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম, দেশের সচেতন জনগোষ্ঠী সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রচারণা চালাবেন বলে আমরা আশা করি। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো এ ব্যাপারে সকল সহযোগিতা প্রদান করবে। নতুন ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত ও আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি এবং গণদুর্যোগ বার্তা ব্যাপক প্রচারের ফলে দেশের জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে ও দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। দুর্যোগকালে জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে আপনাকে-আমাকে-আমাদের সকলকে এজন্য অঙ্গীকারের সাথে কাজ করে যেতে হবে।

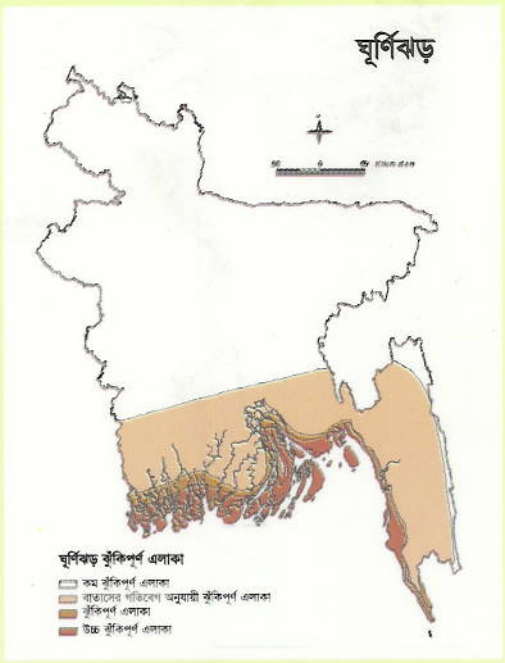

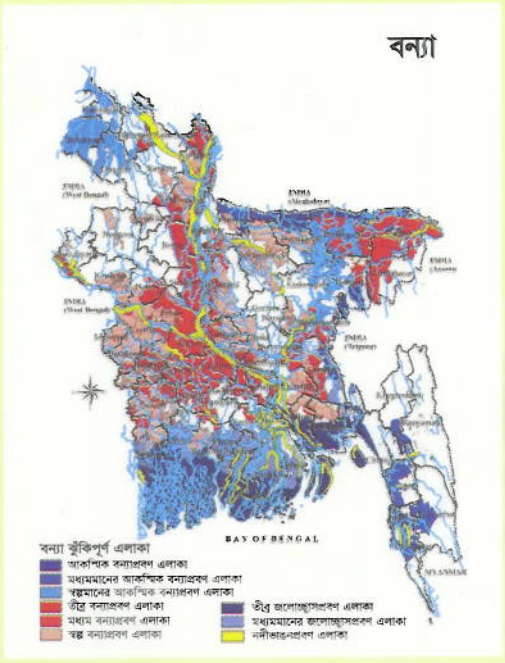

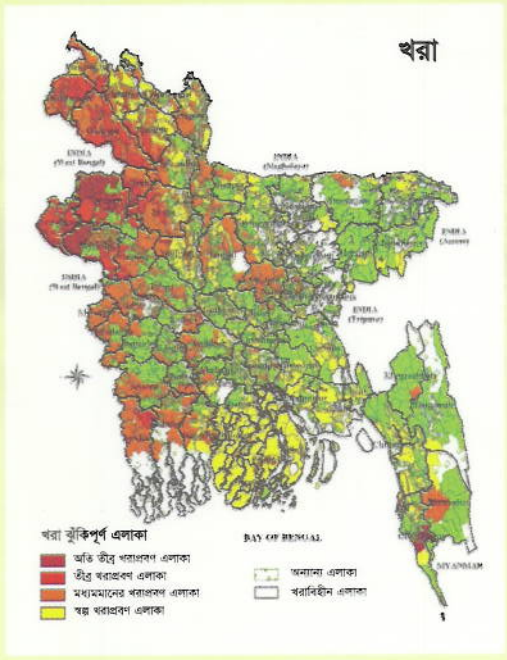

UNDP Bangladesh

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

www.dmb.gov.bd